পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম শ্রেণি







জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

Patient Care Technique-2

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৪৮৯১২

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. নুরে মোজাম্মেল কিরণ

নিগার সুলতানা

ডা. আইরিন বিনতে আজাদ

ডা. এম মুন্তাজিব হায়দার

মো: আসলাম পারভেজ

মো: শাওন কবির সিকদার

মো: আমানউল্লাহ

মুহ: আবদুর রাজ্জাক মিঞা (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : , ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : **, ২০২৪**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর ক া যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

প্রথম অধ্যায়
ক্লিনিক্যাল কেয়ার সাপোর্ট
Clinical Care Support



আমরা দেখেছি একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান অনেক ধরনের সেবা প্রদানের কাজ করে থাকে। যেমন: রোগীকে ঔষধ খাওয়ানো, রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ ও ইনসুলিন দেওয়া, রোগীকে হুইলচেয়ার ব্যবহারে সহায়তা করা প্রভৃতি। এগুলোকে বলা হয় ক্লিনিক্যাল কেয়ারগিভিং কার্যক্রম যা একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের ক্লিনিক্যাল দক্ষতার উল্লেখযোগ্য মানদন্ড নির্দেশ করে। এই কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকাটা অতীব জরুরি। অন্যথায় রোগীর নানারকম অসুবিধা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে পারব
- রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করতে পারব
- রোগীকে ইনসুলিন দিতে পারব
- ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্যাম্পল বা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করতে পারব
- সেবাগ্রহীতাকে সঠিক পজিশনে রাখতে পারব
- সেবাগ্রহীতাকে এক জায়গা হতে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করতে পারব
- হুইলচেয়ার ব্যবহারে রোগীকে সহযোগিতা করতে পারব

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা মোট দুই আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করবো। এই জবের মাধ্যমে আমরা রক্তের গ্লুকোজ মেপে ইনসুলিন দিতে এবং পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে পারব ।

১.১ ওষুধ প্রদান করা

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই কম বেশি রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার সাথে পরিচিত। আমরা অসুস্থ হলে বা সুস্থ থাকার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। ডাক্তার তখন আমাদের শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করে পথ্য-ব্যবস্থাপনা দিয়ে থাকেন। প্রায় প্রতিটি মানুষই নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে ওষধ সেবন করে থাকে। আমরা আমাদের বাসা-বাড়িতেও পরিবারের সদস্যদের অনেক সময় শারীরিক নানা অসুবিধার কারণে ওষধ নিতে দেখি। আবার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অসুস্থ ব্যক্তি যিনি নিজে নিজে ওষধ নিতে পারেন না, তাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিয়মমাফিক ওষধ খাওয়ানো একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের প্রধানতম দায়িত্ব। এ কারণে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে মুখে ওষধ খাওয়ানোর জন্য এ সংক্রান্ত কিছু তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক।

১.১.১ ওষুধ বা ড্রাগ

যে সকল দ্রব্য রোগ নির্ণয়, আরোগ্য লাভ, উপশম, প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং যা মানবদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে তাকে ওষধ বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ওষধ এমন দ্রব্য যার আরোগ্য এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে অথবা যা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। আরো সহজ ভাষায় বলতে গেলে; Drug (ড্রাগ বা ওষুধ) হচ্ছে এমন একটা agent যেটিকে Diagnosis (ডায়াগনোসিস), Prevention (প্রিভেনশন) এবং Treatment (ট্রিটমেন্ট) করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে Diagnosis মানে হচ্ছে কোনো রোগ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বা Reagent ব্যবহার করা । Prevention মানে শরীরে যাতে কোনো রোগ আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য আগে থেকে শরীরকে প্রস্তুত করে রাখা। যেমন Vaccine বা টিকা হচ্ছে এক ধরনের ওষুধ যেটি ব্যবহার করলে শরীরে ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট রোগ সাধারণত আক্রমণ করতে পারে না। Treatment মানে যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় তবে সেই রোগকে নিরাময় করার জন্য ওষুধ ব্যবহার করা। যেমন বিভিন্ন ধরনের Antibiotic আছে যেগুলো treatment এর কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যায় ওষুধ হতে পারে থেরাপিউটিক বা রোগনিরাময়কারী, প্রোফাইলেকটিক বা প্রতিরোধমূলক এবং ডায়াগনস্টিক বা রোগ নির্ণয়মূলক।

ওষুধ **বিজ্ঞানে** ব্যবহৃত **কতিপয় টার্ম / পরিভাষা**

- **ফার্মাকোলজি:** বিজ্ঞানের যে শাখায় একটি ওষুধের উৎস থেকে শুরু করে এটি মানব দেহের উপর যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে "ফার্মাকোলজি" বলে। ফার্মাকোলজি'র দু'টি প্রধান শাখা হলো- ফার্মাকোকাইনেটিকস ও ফার্মাকোডাইনামিক।
- **ফার্মাকোকাইনেটিকস:** ফার্মাকোলজির যে শাখায় ওষুধের শোষণ, বন্টন, বিপাক এবং নিষ্কাশন নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে "ফার্মাকোকাইনেটিকস" বলে।

- **ফার্মাকোডাইনামিক:** ফার্মাকোলজির যে শাখায় দেহের উপর ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে "ফার্মাকোডাইনামিক" বলে।
- **ক্লিনিকাল ফার্মাকোলজি:** চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখা জীব ও মানব দেহের উপর চিকিৎসার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।
- **নিউরোফার্মাকোলজি:** যে শাখা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার উপর ওষুধের প্রভাব সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- **সাইকোফার্মাকোলজি:** যে শাখা মস্তিষ্কের উপর ওষুধের ক্রিয়া ও এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ, আচরণগত পার্থক্য নির্ণয় ও শারীরতাত্ত্বিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- **পোসোলজি:** যে শাখা কিভাবে ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান (নির্ভর করে রোগীর বয়স, ওজন, লিঙ্গ, আবহাওয়া ইত্যাদির উপর) নিয়ে আলোচনা করে।
- **ফার্মাকোগনসি:** যে শাখা ভেষজ গুনাগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীজ পদার্থ থেকে চিকিৎসাগত দ্রব্যাদি আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, সুষ্ঠু বন্টন ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- **ফার্মাকোজেনেটিক্স:** যে শাখা বিভিন্ন জাত, বিভাগ, বর্ণ, তারতম্য ভেদে ঔষধের প্রভাবে পার্থক্য নিরুপণ করা এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে সঠিক পরিমানের ও সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়াযুক্ত ওষুধ নির্বাচন করা নিয়ে আলোচনা করে।
- **ফার্মাকোজেনোমিক্স:** যে শাখা ওষুধ প্রযুক্তিতে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এই সম্পর্কিত বিদ্যমান ওষুধের গুনাবলি এবং নতুন ওষধ আবিষ্কারের নিমিত্তে গবেষণা করে।

১.১.২ বিভিন্ন প্রকার ওষুধ

ওষুধবা ড্রাগকে তাদের উৎস, কার্যকারিতার ধরন, ওষধি ক্রিয়া ও গুণাগুণ প্রভৃতি নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। উৎসের উপর ভিত্তি করে ওষুধকে নিম্নোক্ত ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. **প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ** ভেষজ, উদ্ভিজ্জ, সামুদ্রিক ও খনিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ।

২. **রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ:** এ সকল ড্রাগের কিছু অংশ প্রাকৃতিক ও কিছু অংশ রাসায়নিক উপায়ে তৈরি হয়। যেমন স্টেরয়েডীয় ড্রাগ।

৩. **রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত ড্রাগ** যেমন: প্রোপানোলল

৪. **প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ** যেমন: হরমোন ও এনজাইম বা উৎসেচক।

৫. **অণুজীব উৎস হতে প্রাপ্ত ড্রাগ** যেমন: এন্টিবায়োটিক।

৬. **জীবপ্রযুক্তি ও জীনপ্রকৌশলের মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রাগ:** যেমন: হাইব্রিডোমা টেকনিক।

৭. **তেজস্ক্রিয় বস্তুর মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রাগ** যেমন: Stereotactic Body Radiation থেরাপি, Potassium Iodide (KI) ইত্যাদি।

আরেক ধরনের মুখ্য শ্রেণিবিভাগ হলো-

- সিনথেটিক বা রাসায়নিক উপায়ে তৈরি ড্রাগ
- জৈবলব্ধ উপাদান যেমন- রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন, ভ্যাক্সিন বা প্রতিষেধক, স্টেম সেল থেরাপি ইত্যাদি।

কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে ওষুধকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়-

- **এন্টিপাইরেটিকস:** এগুলো জ্বর (পাইরেক্সিয়া বা পাইরেসিস) কমায়।
- **এনালজেসিক:** এরা বেদনা বা ব্যথার উপশম করে (ব্যথানাশক)।
- **এন্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগ:** ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
- **এন্টিবায়োটিক:** জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে।
- **এন্টিসেপটিক:** পোড়া, কাটা কিংবা ক্ষতের আশেপাশে জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করে।
- **মুড স্ট্যাবিলাইজার:** লিথিয়াম এবং ভ্যালপ্রোমাইড এ কাজ করে।
- **এন্টি স্পাজমোডিক:** মাংশপেশীর স্পাজম কমায়।
- **হরমোন রিপ্লেসমেন্টস:** প্রিমারিন হরমোনের স্বল্পতা দুরীকরনে ব্যবহৃত হয়।
- **এন্টিহেলমেনথিক:** এগুলো কৃমিনাশক ওষুধ ।

১.১.৩ ওষুধ কিভাবে কাজ করে?

ওষুধ বিভিন্ন উপায়ে যেমন, মুখে খাওয়ার মাধ্যমে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। ওষুধ মুখে খাওয়ার পর পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে অন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখানে এগুলো বিশোষিত হয়ে রক্তের মধ্যে মিশে যায় এবং দেহের যে সমস্ত অংশে রক্তের সরবরাহ আছে সেখানে ওষুধ বহন করে নিয়ে যায়। যে সব ওষুধ ইনজেকশন হিসেবে দেওয়া হয় সেগুলো সরাসরি রক্ত স্রোত বা ব্লাড স্ট্রীমে মিশে যায়। এজন্য ইনজেকশন তাড়াতাড়ি কাজ করে। ওষধ শুধুমাত্র দেহের একটি অংশে কাজ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেও রক্তস্রোত এই ওষুধের দেহের অনেক অংশে নিয়ে যায়। সেজন্য দেহের অন্যান্য অংশেও ওষুধ অযাচিতভাবে কাজ করতে পারে। যেমন: এসপিরিন- ইহা স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে ব্যথা উপশম করে। কিন্তু এটা আবার পাকস্থলীর ঝিল্লীতেও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে(যা ক্ষতিকর হতে পারে), তাছাড়া এসপিরিন অস্থি সন্ধির প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে (যা উপকারী হতে পারে)। এ ধরনের ফলাফলকে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা সাইড ইফেক্ট বলা হয়। এছাড়াও এসপিরিন রক্তকে পাতলা করে বলে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের দেওয়া হয়। দেহে ওষুধের কাজ বিভিন্ন রকম হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন কাজ রয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু নীচে বর্ণনা করা হলো:

১। যে সমস্ত ঔষধ রোগ জীবানুকে ধ্বংস করে। যেমন-

- এন্টিবায়োটিক- যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, এমক্সাসিলিন, কোট্রাইমোক্সাজল, টেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি এন্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ । এছাড়াও new generation এর আরো অনেক antibiotics আছে।
- এন্টিপ্যারাসাইটিক- যা পরজীবিকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে। যেমন, বিভিন্ন ধরনের কৃমি হলো পরজীবি। এলবেনডাজল, মেবেনডাজল, লিভামিসল ইত্যাদি কৃমিনাশক ওষুধ ।

২। যে সমস্ত ঔষধ কোনো অঙ্গ বা তন্ত্রের উপর কাজ করে। যেমন-

- **স্নায়ুতন্ত্রের উপর:** উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রশান্তিদায়ক বা স্নায়ুর উত্তেজনা শান্তকারক ওষুধ (Tranquilizer/Sedative), যেমন- ডায়াজিপাম। ব্যথানাশক ওষুধ (Analgesic), যেমন- প্যারাসিটামল, এসপিরিন, ডিসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, হাইওসিন বিউটাইল ব্রোমাইড ইত্যাদি। জ্বর উপশমকারী ওষুধ (Antipyretic), যেমন- প্যারাসিটামল। অনুভুতিনাশক ওষুধ (Anaesthetic), যেমন-লিগনোকেইন (Lignocaine) ইত্যাদি।

- **জরায়ুর উপর:** প্রসবের পর রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ওষুধ জরায়ুর ম্যাংসপেশীর সংকোচন বাড়িয়ে দেয়। যেমন-অক্সিটোসিন, আরগোমেট্রিন।
- **ফুসফুসের উপর:** হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এ ওষুধ ফুসফুসের বাতাস প্রবেশের পথকে প্রসারিত/বড় করে দেয়। এগুলোকে ব্রংকোডাইলেটর (Bronchodilator) বলা হয়। যেমন- সালবিউটামল, থিওফাইলিন ইত্যাদি।

৩। যে সমস্ত ঔষধ খাদ্যের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে: এসব ওষুধ খাদ্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ যোগান দেয় যখন কোনো ব্যক্তি খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাচ্ছে না অথবা তা শরীরে বিশোষিত (Absorption) হচ্ছে না। যেমন: ভিটামিন-এ, আয়রন, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি।

৪। যে সমস্ত ওষধ দেহের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ ঠিক করে: যেমন- এন্টাসিড, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি। খাবার স্যালাইন একজন রোগীর ডায়রিয়াজনিত কারণে নির্গত পানি ও লবনের অভাব পূরণ করে।

রোগ/উপসর্গ অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ওষুধের পরিচিতি:

ক্র.	রোগ/উপসর্গ	নির্দেশিত ওষুধ (জেনেরিক নাম)
০১	শ্বাস তন্ত্রের সংক্রমণ	ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, কোট্রাইমক্সাজল
০২	জ্বর ব্যথা	প্যারাসিটামল, এসপিরিন, আইবুপ্রোফেন, এন্ডোমেথাসিন
০৩	পেট ব্যথা	হাইওসিন বিউটাইল ব্রোমাইড, ডোটাভেরিন
০৪	হাপানী	সালবিউটামল, এমাইনোফাইলিন, থিওফাইলিন
০৫	সাধারণ সর্দি-কাশি এলার্জি	প্রোমেথাজিন, ক্লোরফেনিরামিন
০৬	চুলকানি ও খোসপাঁচড়া	বেনজাইল বেনজোয়েট, পারমেথ্রিন
০৭	কৃমি	মেবেনডাজল, এলবানডাজল
০৮	রক্তস্বল্পতা	আয়রণ ও ফোলিক এসিড
০৯	বমি, বমি ভাব	ডমপেরিডোন মেলিয়েট
১০	ম্যালেরিয়া	ক্লোরোকুইন, কুইনাইন
২	অনিদ্রা ও মৃদু শান্তকারক	ডায়াজিপাম
১২	মুখের কোনায় বা জিহবায় ঘা	রিবোফ্লাবিন
১৩	অপুষ্টি, দুর্বলতা	ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, মাল্টিভিটামিন

ড্রাগ স্টোরেজ বা ওষধ সংরক্ষণ

ক্লিনিক বা বাসায় যেখানেই হোক না কেন, ওষুধের সংরক্ষণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক সময়ে মডেল ফার্মেসীগুলোতে ওষুধ সংরক্ষণ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। সেই ওষুধ আমাদেরকে সেবাদান কেন্দ্রে কিংবা বাসাবাড়িতে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হয়। এ সকল জায়গায় বেশি তাপ, বাতাস, আলো এবং আর্দ্রতা ওষুধকে নষ্ট করতে পারে। তাপ ও ময়েশ্চারে ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল জাতীয় ওষুধ সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। সেই ওষুধ খেলে পেটের সমস্যা হতে পারে। আবার তরল ইঞ্জেকশন বা সিরাপ একবার সেবনের পর বেশিদিন রাখা উচিৎ নয়।

ইনসুলিন ও লিকুইড অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে বেশি সাবধানতা নেওয়া উচিত। যেমন, ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সাধারণত ৩০দিন পর্যন্ত ঠিক থাকে ইনসুলিন। তাই এ ধরনের ওষুধকে ফ্রিজে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আরো কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলা যায়, যেমন:

- ওষুধের খাপ থেকে ওষুধ খুলে রাখা যাবে না।
- ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় ওষধ রাখতে হবে। না হলে মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই ওষুধ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- আগুন, স্টোভ, সিঙ্ক এবং গরম কোনো সরঞ্জাম থেকে দূরে রাখতে হবে।
- ওষুধের বোতল থেকে তুলোর বল বের করে নিতে হবে। কারণ, এই তুলো থেকে ময়েশ্চার জন্ম নিতে পারে। প্লাস্টিকের ব্যাগে ওষুধ রাখা যাবে না। রাখলে ওষুধের প্রভাব বা কর্যকারিতা কমে যেতে পারে।
- একটি পাত্রে অনেক ওষুধ একসঙ্গে না রাখাই উত্তম। অন্যথায় মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই বদলে যেতে পারে ওষুধের বর্ণ ও গন্ধ। যেকোনো ওষুধ অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

১.১.৪ রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন

যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোক না কেন, ঔষধ সাধারণত শরীরের নির্দিষ্ট কিছু স্থান বা জায়গা দিয়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। Route বলতে বোঝায় এমন একটা পথ যার মধ্য দিয়ে একটা মেডিসিন (Drug) শরীরে প্রবেশ করে শরীরের নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে কাজ করে। ড্রাগ যখন শরীরে কাজ করে তখন তাকে Pharmacological Action বলে। তাহলে একটি ড্রাগ শরীরে কোন পথে প্রবেশ করবে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে যাবে, সেই রাস্তার সাথে মেডিসিনের সম্পর্ক কেমন হবে সেটাকে ওষুধের রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান (routes of administration) বলে। একটি ড্রাগ কি ধরনের রুট দিয়ে শরীরে প্রবেশ ও কাজ করবে তা কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলো হচ্ছে-

ক. ওষুধের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন: একটা ড্রাগ কঠিন, তরল নাকি গ্যাসীয় তার উপর নির্ভর করবে সেই ড্রাগ কোন পথে মানবদেহে প্রবেশ করবে। উদাহরণস্বরূপ; Solid বা কঠিন ড্রাগগুলো শরীরে প্রবেশের পর সেটি ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরাতে পরিণত হয় (Disintegration ঘটে) এবং সবশেষে শরীরে শোষিত হয় (Dissolve ঘটে)। আবার Liquid বা তরল ওষুধ শরীরে প্রবেশের পর কেবলমাত্র শোষিত হয় বা Dissolve হয়। অন্যদিকে গ্যাসীয় ড্রাগগুলো শরীরে নাক বা মুখ দিয়ে প্রবেশ করে এবং সরাসরি এরা ফুসফুসে কাজ করে। এছাড়া ড্রাগ এর রুট নির্ভর করে সেটির দ্রাব্যতা এবং pH এর উপরেও।

খ. নির্দিষ্ট কাজের জন্য পছন্দসই জায়গা: এর মানে হচ্ছে একটা ওষুধ শরীরের ঠিক কোন জায়গায় কাজ করবে সেটা নির্বাচন করা। যদি আমাদের গালে ব্রণ উঠে তবে চিকিৎসক এমন ওষুধ দিয়ে থাকেন যেটা শুধুমাত্র গালের ওই ব্রণের অংশটাতে কাজ করে। আবার আমরা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে চিকিৎসক এমন ঔষধ দিয়ে থাকেন যেটা পুরো শরীর জুড়ে কাজ করে। কাজেই Route of Drug

Administration এক্ষেত্রে ভালো ভূমিকা পালন করে এবং ড্রাগের পথ ঠিক করে দেয়, যাতে সে আমাদের শরীরের নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে।

গ. ওষুধ শোষিত হবার শতকরা হার: এর মানে হচ্ছে একটি ওষুধ কোন পথে প্রবেশ করালে তা শরীরে সর্বোচ্চ পরিমানে শোষিত হবে সেটা। সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়ার জন্য ওষুধকে এমন রূটের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করাতে হবে যাতে সেটি সর্বোচ্চ পরিমানে শোষিত হয়।

ঘ. ওষুধের বিপাক: ঔষধের মেটাবলিজম বা বিপাক বলতে ওষুধ শরীরে প্রবেশের পর তার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনকে বুঝায়। এটিকে ঔষধের বায়োট্রান্সফর্মেশনও বলা হয়ে থাকে। ঔষধের বিপাক দুই ধরনেরঃ First pass, By pass। First pass হচ্ছে গতানুগতিক পথ দিয়ে ড্রাগের পথ চলা, যেমন আমাদের মুখ দিয়ে কোনো ট্যাবলেট সেবন করলে সেটা অন্ননালী দিয়ে পাকস্থলীতে যাবে, সেখান থেকে অন্ত্রে যাবে, তারপর যকৃত হয়ে রক্তে যাবে। এক্ষেত্রে ড্রাগের কার্যক্ষমতা কমে যাবে। কিন্তু সরাসরি সে ড্রাগকে যদি রক্তে প্রয়োগ করা হয় তবে সেটি পুরোপুরি কাজ করবে। এই পদ্ধতিকে By pass বলে।

ঙ. কার্য্যকারিতার দ্রুততা: এর মানে হচ্ছে ওষুধ শরীরে প্রবেশের পর কত দ্রুত কাজ করবে। এক্ষেত্রেও Route of Drug Administration ভূমিকা রাখে। মুখে খাওয়ার ওষুধের চেয়ে সরাসরি শিরার মাধ্যমে রক্তে ইনজেকশন প্রয়োগ করলে সেটি অধিকতর দ্রুত কাজ করে।

চ. রোগীর অবস্থা: রোগী যদি শিশু হয় তবে তাকে সিরাপ বা Liquid জাতীয় ড্রাগ দিতে হয়, রোগী যদি কোমাতে থাকে তবে তাকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ শরীরে দিতে হয়, রোগী যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তবে তাকে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল হিসেবে ড্রাগ খাওয়ানো যেতে পারে।
এ সকল বিষয় বিবেচনা করেই একজন চিকিসক Drug এর Route নির্বাচন ও নির্ধারণ করে থাকেন।

বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হলেও রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন মুলত দুই প্রকার:

১. এন্টেরাল (Enteral): এটি হচ্ছে ড্রাগ চলাচলের এমন পথ যেখানে ড্রাগ সরাসরি ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্তের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। যেমন- Oral Route, এটির মাধ্যমে মুখ দিয়ে ট্যাবলেট, সিরাপ, ক্যাপসুল ইত্যাদি ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌছায়। এই রুট ব্যবহার করা তুলনামূলকভাবে সহজ। এটির অসুবিধা হচ্ছে এটি First Pass পদ্ধতি যেখানে ড্রাগের কার্যক্ষমতা কিছুটা কমে যায়, সাথে সাথে এই ড্রাগ শরীরে কাজ করে না। কিছুটা সময় নেয়।

২. প্যারেন্টাল (Parental): কোনো ড্রাগ যদি ক্ষুদ্রান্ত-বৃহদান্ত বাদে অন্য কোনো পথে শরীরে প্রবেশ করে সঠিক জায়গাতে গিয়ে কাজ করে তবে তাকে Parental রুট বলে। Parental Route নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত। যেমন:

ক. সাবলিঙ্গুয়াল (Sublingual) রুটঃ আমাদের জিহবার নিচে যদি কোনো ট্যাবলেট রাখা হয় তবে সেটি জিহবার নিচের ক্যাপিলারির মাধ্যমে সরাসরি নির্দিষ্ট জায়গার পৌছে যায়, ক্ষুদ্রান্ত – বৃহদান্তে যায় না।

খ. বাক্কাল (Buccal Route) রুট: যখন কোনো ট্যাবলেট মুখের ভেতর গালের কোণায় রাখা হয় তখনও ক্যাপিলারির মাধ্যমে সেটি নির্দিষ্ট স্থানে চলে যায় ক্ষুদ্রান্ত্র-বৃহদান্ত্র পার না হয়েই।

গ. রেকটাল (Rectal) রুট: শরীরের Rectal অংশে বা পায়ুপথে সরাসরি ড্রাগ প্রয়োগ করা যায়, এক্ষেত্রে সেটি দ্রুত কাজ করে।

ঘ. সাব-কিউটেনিয়াস (Sub-cutaneous বা s/c Route) রুট: শরীরে যখন ত্বকের নিচে ড্রাগ পৌঁছানোর জন্য ইনজেকশন দেওয়া হয় তখন ড্রাগ যে রাস্তা ধরে সরাসরি নির্দিষ্ট অংশে যায়, তাকে Sub Cutaneous Route বলে। যেমন- ডাইবেটিক রোগীর ইনসুলিন এই ধরনের route ফলো করে। এটির সুবিধা হচ্ছে ড্রাগ সরাসরি কম সময়ে কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছে যায়। এর অসুবিধা হচ্ছে এটির ফলে ত্বকের নিচে থাকা নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষতি হতে পারে।

ঙ. ইনহেলেশনাল (Inhalational Route) রুট: যখন গ্যাসীয় ড্রাগ সরাসরি ফুসফুসে যায় তখন এই route কাজ করে। এক্ষেত্রে সরাসরি ড্রাগ ফুসফুসে গিয়ে সেখানকার কৈশিক জালিকার (Capillary) মাধ্যমে রক্তে পৌঁছে যায়। তাই এই ধরনের পথ ব্যবহারের ফলে ড্রাগটি খুব দ্রুত শরীরের ভেতরে কাজ করতে পারে।

চ. ন্যাসাল (Nasal) রুট: এক্ষেত্রে নাকের ভেতরে ড্রপলেট আকারে ড্রাগ ব্যবহার করা হয়, যেখানে ড্রাগটি নির্দিষ্ট পথ ধরে শরীরের কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছে যায়। এই পথকে Nasal Route বলে। যেমন – সোয়াইন ফ্লু এর ড্রাগ তরল প্রকৃতির। নেবুলাইজার নামক যন্ত্রের মাধ্যমে এই ড্রাগকে নাকের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে ফ্লু'এর প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করানো হয়।

ছ. ইন্ট্রামাস্কুলার (Intramuscular বা IM Route) রুট: ইনজেকশনের মাধ্যমে পেশীর ভেতরে ড্রাগ সাপ্লাই দেওয়ার ক্ষেত্রে এই Route কাজ করে। এক্ষেত্রেও ড্রাগ খুব দ্রুত কাজ করা শুরু করে কিন্তু একটা অসুবিধে হলো এই সিস্টেমে পেশীতে বেশ ব্যথা অনুভূত হয়।

জ. ইন্ট্রাভেনাস (**Intravenous বা IV Route**) রুট: যে Route ব্যবহার করে শরীরের রক্তনালী বা Vein এর মধ্যে ড্রাগ প্রয়োগ করলে সেটি শরীরের মধ্যে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেটিই Intravenous route এটি প্রয়োগের সুবিধা হচ্ছে খুব দ্রুত এটি শরীরে কাজ করতে পারে। তবে এর একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে যদি ভুল জায়গায় ইনজেকশন দেওয়া হয় তবে সেই জায়গা থেকে ড্রাগকে আর বের করে আনা যায় না। প্রধানত Fast & Quick Action এর জন্য শরীরে এই Route ব্যবহার করে ড্রাগ প্রয়োগ করা হয়।

ঝ. ইন্ট্রা-আর্টিকুলার (Intra-articular) রুট: যেসব ড্রাগকে শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে, দুটো হাড়ের সংযোগস্থলে প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে Intraarticular Route বলে।

ঞ. ইন্ট্রা-আর্টারিয়াল (Intra-arterial) রুট: যেসব ড্রাগ আর্টারিতে সাপ্লাই দেওয়া হয় সেগুলো এই Route অনুসারে কাজ করে।

এছাড়া আরো একধরনের রুট হচ্ছে টপিক্যাল রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন। টপিক্যাল ওষধগুলো শরীরের ত্বক বা শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যেমন: ক্রিম, ফোম, জেল, লোশন, মলম প্রভৃতি। ডাক্তার বা নার্সরা হাসপাতালে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রুট ব্যবহার করলেও, পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান হিসেবে আমরা কেবলমাত্র মুখে খাওয়ার ওষধ, টপিক্যাল এডমিনিস্ট্রেশন এবং সাব-কিউটেনিয়াস ইনজেকশন প্রভৃতি নিয়ে কাজ করবো। আরো সহজ করে বললে, যে সকল ওষুধ ব্যক্তি নিজে নিজেই নিতে পারেন বা Self administered medication হিসেবে বিবেচ্য সেগুলো নিয়েই পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান কাজ করতে পারবে।

১.১.৫ ওষুধের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ পথের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ

প্রধান প্রধান প্রয়োগ পথগুলোর সুবিধা-অসুবিধা নীচে উল্লেখ করা হলো:

১) মুখে খাওয়া (Oral Route)

সুবিধা:

ক) নিরাপদ, সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং তুলনামূলকভাবে খরচ অনেক কম।

খ) সহজেই প্রয়োগ করা যায়। রোগী নিজে বা তার আত্মীয়স্বজন ওষুধ প্রয়োগ করতে পারে।

গ) সূঁচ ফোড়ানোর ভয় ও উদ্বেগ থাকে না এবং ব্যথা পাওয়া বা ব্যথা সহ্য করতে হয় না।

ঘ) এই পথে ব্যবহৃত ওষুধ ইনজেকশনের মত সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা:

ক) অনেক সময় বমি হতে পারে এবং গৃহীত ওষুধ বেরিয়ে যেতে পারে।

খ) কিছু কিছু ওষুধ পাচক রস দ্বারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেজন্য দেহের যেখানে প্রয়োজন সেখানে পৌঁছায় না।

গ) কিছু ওষুধ খাদ্যের সাথে মিশে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করতে পারে যা সহজে বিশোষিত হতে পারে না।

ঘ) ডায়রিয়ার কারণে পর্যাপ্ত সময় অন্ত্রে না থাকার ফলে অনেক ওষুধ সম্পূর্ণরূপে বিশোষিত হতে পারে না।

ঙ) কিছু ওষুধ অন্ত্র থেকে মোটেই বিশোষিত হয় না।

চ) অন্ত্রে বিশোষিত হতে সময় লাগে তাই ইনজেকশনের তুলনায় মুখে খাওয়ার ওষুধ দেরীতে কাজ শুরু করে।

ছ) জরুরি অবস্থা, অজ্ঞান, মুখে খেতে চায়না ও অসহযোগী রোগীদের ক্ষেত্রে এই পথে ওষুধ প্রয়োগ উপযুক্ত নয়।

২) জিহ্বার নিচে (Sub-lingual Route)

এই পথে ওষুধ জিহ্বার নীচে রেখে আস্তে আস্তে গলতে দেওয়া হয়। জিহ্বার শ্লেষ্মা ঝিল্লীর মাধ্যমে এগুলো রক্ত স্রোতের সাথে মিশে যায় এবং খাওয়ার ওষুধের মত গিলতে হয় না এবং পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে যেতে হয় না।

সুবিধা:

ক) অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিশোষিত হয়।

খ) চাহিদা অনুযায়ী ফল লাভের পর অবশিষ্ট ওষুধ ফেলে দেওয়া যায়।

অসুবিধা:

ক) যে সেকল ওষুধ স্বাদে অতৃপ্তিকর এই পথ সেসব ওষুধের জন্য উপযুক্ত নয়।

৩) ইনজেকশন (Injection)

সুবিধা:

ক) দ্রুত বিশোষিত হয়, যেহেতু পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় না।

খ) ওষুধের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া যায়।

গ) ওষুধের পরিমাণ শুদ্ধরূপে নিরূপন করা যায়।

ঘ) অজ্ঞান ও অসহযোগী রোগীদেরকে প্রয়োগ করা যায়।

ঙ) অতিরিক্ত বমির জন্য যে সব রোগী ওষুধ খেতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে এই পথে ওষুধ প্রয়োগ ফলদায়ক।

অসুবিধা/সাবধানতা:

ক) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থান জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয় ও জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হয় ।

খ) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থানে ব্যথা ও এমনকি ফৌড়া হতে পারে।

গ) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থানে রক্তনালী বা স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। স্নায়ুর আঘাতের ফলে মাংসপেশী দুর্বল ও অবশ হতে পারে।

ঘ) নিজে নিজে প্রয়োগ করা উচিত নয়। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন হয়।

ঙ) মাংসপেশীতে দেবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ইঞ্জেক্টেবল ড্রাগ দেওয়া কোন ভাবেই উচিত নয়।

১.১.৬ ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলতে বুঝায় একটি ওষুধ কোন রোগীকে নির্দিষ্ট একটি রোগের চিকিৎসা হিসেবে প্রয়োগ করা হলে তার স্বাভাবিক বা কাঙ্খিত ক্রিয়ার পাশাপাশি শরীরে অন্যান্য কিছু প্রতিক্রিয়া হওয়া। এটিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় side effect (সাইড ইফেক্টস)। সাধারণ কিছু সাইড ইফেক্টের মধ্যে পেটের সমস্যা হওয়া, মুখ ও ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া, ঘুমঘুম ভাব, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ড্রাগ ওভারডোজ

১। অনেকে ভাবেন, কড়া ডোজে বেশি ওষুধ খেলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। ওষুধ না জেনে খাওয়ার ফলে রোগী ছটফট করতে থাকেন, বুক ধড়ফড় করে, ঘাম হয়, ব্লাড প্রেশার ওঠানামা করে, হার্টবিটও কম-বেশি হয়। সময়মতো চিকিৎসা না হলে রোগী অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। এক একটি ওষুধের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া একেক রকম। তাই একে অপরের সাথে গুলোয়ে ফেলা উচিত নয়।

২। ড্রাগ ওভারডোজ বাড়াবাড়ি রকমের হলে, দেরি না করে হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন।

৩। প্রেগনেন্সির সময় ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাওয়া যাবেনা। অন্যথা গর্ভস্থ সন্তানের হার্টের সমস্যা,স্পাইনাল কর্ডের সমস্যা, জন্ডিস, ব্লাড সুগার কমে যাওয়া, ইত্যাদি নানা রকমের অসুখ হতে পারে।

১.১.৭ ওষুধের মাত্রা ও প্রচলিত শব্দ

ওষুধের মাত্রা (Drug Dosage)

ঔষধের মাত্রা বলতে বুঝায় কি পরিমাণ ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে তার পরিমাণ কে। ওষুধের মাত্রা সাধারণভাবে নিচের এককগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

ক. ওজন- গ্রাম (gm) বা মিলিগ্রাম (mg)

খ. পরিমাণ (Volume)- মিলিলিটার (ml) বা কিউবিক সেন্টিমিটার (cc)

গ. ইউনিট (Unit).

ওষুধের মাত্রা বা পরিমাণকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো প্রভাবিত করে:

১। দেহের ওজন - রোগীর ওজন যত কম হবে ওষুধের মাত্রাও তত কম হবে।

২। প্রয়োগের পথ - ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুলের তুলনায় ইনজেকশনের মাত্রা কম হয়।

৩। রোগের তীব্রতা - কখনও কখনও অসুখের তীব্রতা বেশী হলে বেশী মাত্রায় ওষধ দিতে হয়।

৪। প্রয়োগের ব্যবধান - একই ওষধ কম ব্যবধানে ব্যবহার করলে বেশী ব্যবধানের চেয়ে মাত্রা কম দরকার হয়।

৫। গর্ভাবস্থা - অনেক ওষধ গর্ভাবস্থায় কম মাত্রায় দেওয়া হয়।

১.১.৮ ওষুধ খাওয়ানোর নিয়মাবলি

রোগ হলে সুস্থ হওয়ার জন্য ওষুধ সেবন করতে হয়। কোনো ওষুধই নিজে নিজে খাওয়া ঠিক নয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে লিখিত প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে ওষুধ সেবন করা জরুরি। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান কেয়ারগিভিং কাজে রোগীকে প্রায়ঃশই ওষুধ খাইয়ে থাকেন অথবা ওষুধ খাওয়াতে সহযোগীতা করে থাকেন। তবে ওষুধ সেবনের সময় কিছু ভুলের কারণে এর সম্পূর্ণ উপকারিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। এসব ভুলের কারণে পরবর্তীকালে রোগীর শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এমনকি রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ওষুধ খাওয়ানোর সাধারণ কিছু নিয়মাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো:

- শুরুতে ওষুধ খাওয়ার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া উচিত। রোগী হাতে ওষুধ খেতে অক্ষম হলে, সেক্ষেত্রে কেয়ারগিভারকে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। কারণ, আমাদের শরীরের প্রায় সকল রোগই ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, প্যারাসাইট ইত্যাদির জন্য হয়ে থাকে। আর হাত পরিস্কার না করে ওষুধ খেলে ওই জীবানু আরো বেশি করে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
- এবার চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষধের সাথে ফার্মেসি থেকে কিনে নিয়ে আসা ঔষধ ভালোভাবে মিলিয়ে নিতে হবে। মিল না থাকলে সে ওষুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ ভুল ওষুধ মৃত্যু ঢেকে আনতে পারে। প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

- এবার দেখতে হবে ওষুধের মেয়াদ আছে কিনা। ওষুধের মোড়কে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ দেওয়া থাকে। মেয়াদবিহীন ওষুধ বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে।
- ডাক্তারের নির্দেশনা মোতাবেক সঠিক রুটের মাধ্যমে সঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে। যেমন, কোন ঔষধ খাবার আগে খেতে বলা হয়, আবার কোনটি বলা হয় খাবার পরে। এই সমস্ত নির্দেশনা সাধারণত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে সুস্পষ্টভাবে লিখা থাকে। কেয়ারগিভারকে সেই সমস্ত নির্দেশনা ভালোমত পড়ে, বুঝে অনুসরণ করতে হবে।

ওষুধ খাওয়ানোর ছয়টি বিষয়:

১. সঠিক রোগী বা ব্যক্তি: রোগীর নাম, বয়স, রোগ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের সাথে মিলিয়ে সঠিক রোগীকে সনাক্ত করতে হবে।

২. সঠিক ওষধ: ওষুধের নাম, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, ডোজ, রুট, অন্যান্য নির্দেশনা যাচাই করে সঠিক ওষুধ শনাক্ত করা।

৩. সঠিক ডোজ বা পরিমাণ: সঠিক পরিমানের ওষুধ নিতে হবে।

৪. সঠিক রুট: ডাক্তার যেভাবে ওষুধ প্রয়োগ করার জন্য প্রেসক্রিপশনে লিখেছেন সেই রুট নির্ধারণ করা।

৫. সঠিক সময়: নির্ধারিত সময়ে ওষুধ খাওয়ানো।

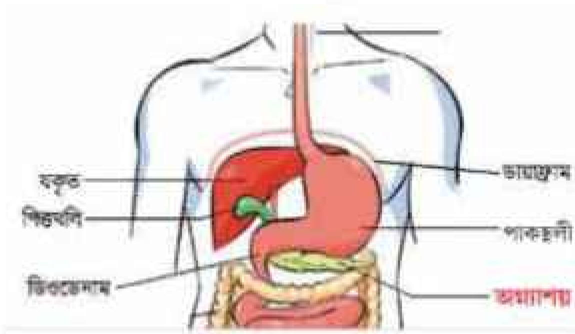
৬. সঠিকভাবে রেকর্ড করা: সমস্ত কাজ সমাপ্ত হবার পর সঠিকভাবে রেকর্ড শীটে রেকর্ড করা।

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ভালোভাবে বুঝে তারপর ওষুধ খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে কোনপ্রকার ভূল করা যাবেনা। কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে ডাক্তার, নার্স বা উর্ধত্বন কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ডাক্তাররা সাধারণত কোন ওষুধ কখন ও কিভাবে খেতে হবে তা কিছু সংক্ষেপিত শব্দ দিয়ে লিখে থাকেন। যেমন:

- bid- দিনে ২বার। অর্থাৎ ১২ ঘন্টা পর পর।
- tid- দিনে ৩বার। অর্থাৎ ৮ ঘন্টা পর পর।
- qid- দিনে ৪ বার। অর্থাৎ ৬ ঘন্টা পর পর।
- hs- রাতে শুবার সময়।
- ac- খাবার আগে
- pc- খাবার পরে
- NPO- মুখে কোন কিছু খাওয়া যাবে না ইত্যাদি।

সকল ধরনের ওষুধ ডাক্তারদের পরামর্শে অনুযায়ী সঠিক সময় মত রোগীকে সেবন করাতে হবে।

১.২ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাপ ও ইনসুলিন প্রদান



চিত্র ১.১: অগ্নাশয় মানবদেহে ইনসুলিন তৈরি করে

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, রক্ত আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অভ্যান্তরীণ পরিবহন মাধ্যম। এটি বাহিত হয় শিরা বা ধমনীর মধ্য দিয়ে। রক্ত দেহের প্রতিটি টিস্যুতে পৌঁছে দেয় খাবার ও অক্সিজেন। টিস্যুর বৃদ্ধি ও ক্ষয়রোধের জন্য এ খাবার ও অক্সিজেন অপরিহার্য। এছাড়া দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসরিত হরমোন রক্তের মাধ্যমেই পৌঁছে যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, নিশ্চিত করে ওই অঙ্গের কর্মক্ষমতাকে। এমনই একটি হরমোনের নাম হচ্ছে ইনসুলিন। ইনসুলিন একটি প্রোটিনধর্মী হরমোন। এটি দেহের অপ্রয়োজনীয় গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে দেহকে সঠিক পরিমাণের গ্লুকোজ সরবরাহে সাহায্য করে। গুরুত্বপূর্ণ এই হরমোনটি তৈরি হয় দেহের প্যানক্রিয়াস নামের অঙ্গে। বাংলায় প্যানক্রিয়াসকে বলে অগ্ন্যাশয়। এই শিখনফলে আমরা রক্তের গ্লুকোজের নরমাল ভ্যাল্যু, এর তাৎপর্য, বহুমূত্র রোগ এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবো। ইনসুলিন পরিমাপ করার পাশাপাশি ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী বহুমূত্র রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীও আমরা এই শিখন ফলে অনুশীলন করব।

১.২.১ রক্তের গ্লুকোজ ও এর স্বাভাবিক মাত্রা

শর্করা মানবদেহের শক্তির মূল জোগানদাতা। শর্করা ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ বা চিনি। আমরা যখন শর্করা জাতীয় খাবার খাই, সেটি যে খাবারই হোক, যে পরিমাণই হোক, শরীরে সেই খাবার গ্লুকোজ হিসেবেই জমা হয়। শরীরের স্বাভাবিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার জন্য এই গ্লুকোজের নিয়মিত ভাঙ্গন বা নিয়ন্ত্রন অতীব জরুরি, যে কাজটি করে থাকে ইনসুলিন নামক হরমোন যেটি নিঃসৃত হয় অগ্নাশয়ের আইলেট্স অব লেঙ্গারহেন্স থেকে। রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ না করলে হৃদরোগ, কিডনি রোগ ও দৃষ্টিশক্তি হারানোর মতো জটিলতার ঝুঁকি রয়েছে। মানবদেহে গ্লুকোজের স্বাভাবিক পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাওয়ার আগে প্রতি লিটার রক্তে ৩.৯-৫.৬ মিলিমোল এবং খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর ৭.৮ মিলিমোলের নিচে গ্লুকোজের মাত্রা থাকলে তাকে স্বাভাবিক বলা যায়। এর বেশি হলেই কোনো ব্যক্তির ডায়াবেটিস আছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে বয়স, অন্যান্য অসুখ, ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা, গর্ভাবস্থা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে রক্তে গ্লুকোজের লক্ষ্যমাত্রা ভিন্নতর হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে নিতে হবে। কোনো কোনো গ্লুকোমিটার মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার (mg/dl) এককে গ্লুকোজের ফলাফল দেয়, এ ক্ষেত্রে এই মাত্রাকে ১৮ দিয়ে ভাগ করলে মিলিমোল পার লিটার (mmol/L) এককে ফলাফল পাওয়া যাবে।

নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা

সুস্থ্য বা অসুস্থ্য যেকোনো বয়সের মানুষের জন্যই নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন সম্ভব না হলেও সপ্তাহে অন্তত একদিন অবশ্যই রক্তের গ্লুকোজ মেপে দেখা উচিত। আর ডায়াবেটিক বা বহুমূত্র রোগীর জন্য ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী রক্তের এ পরীক্ষা দিনের বিভিন্ন সময়ে করতে হতে পারে যেমন: সকালে খালি পেটে, নাশতার দুই ঘণ্টা পরে, দুপুরে খাওয়ার আগে ও পরে, রাতে খাওয়ার আগে ও পরে প্রভৃতি। রোগী যদি নিজে নিজে করতে সক্ষম না হয়, গ্লুকোমিটার নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান বা কেয়ারগিভার খুব সহজেই এই পরীক্ষাটি করতে পারে। প্রাপ্ত ফলাফল ভালোভাবে রেকর্ড করে ডাক্তার বা নার্সকে রিপোর্ট করতে হয়।

রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপের পদ্ধতি:

রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য জরুরি। এই জরুরি কাজটিই কেবলমাত্র এক ফোঁটা রক্ত ব্যবহার করে তাতক্ষনিকভাবেই সম্পাদন করা যায়। সে জন্য প্রয়োজন হয় গ্লুকোমিটার নামক একটি যন্ত্র। গ্লুকোমিটার থাকলে সহজে ঘরে বসে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই কাজটি করতে পারেন। যন্ত্রটি হাতের কাছে রাখা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও জটিলতা প্রতিরোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে বিভিন্ন নামে গ্লুকোমিটার পাওয়া যায়। সকল গ্লুকোমিটারের ক্ষেত্রেই রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করার পদ্ধতি একই রকম। নিচে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের জন্য রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো:

১। প্রথমেই কেয়ারগিভারকে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে। রোগীকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করবে এবং তার অনুমতি গ্রহণ করবে।

২। গ্লুকোমিটারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে কার্যকারিতা যাচাই করে নিতে হবে। সুঁই বা নীডল লেনসেট পেনে ঠিকভাবে লাগিয়ে নিতে হবে।

৩। রোগীর যে আঙুল থেকে রক্ত নেয়া হবে সেটি নির্বাচন করতে হবে। অ্যালকোহল প্যাড বা জীবাণুনাশক দিয়ে আঙুলের মাথা পরিষ্কার করে নিয়ে পুরোপুরি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

৪। গ্লুকোমিটারে একটি পরীক্ষার স্ট্রিপ প্রবেশ করাতে হবে। গ্লুকোমিটারের মডেলভেদে স্ট্রিপ আলাদা হয়, তাই শুধু নির্দিষ্ট মিটারের জন্য প্রযোজ্য নির্দিষ্ট স্ট্রিপ ব্যবহার করতে হবে । নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ স্ট্রিপ ব্যবহার করা যাবেনা, এতে ভুল ফলাফল আসতে পারে। স্ট্রিপের কৌটা খোলার পর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, এ বিষয়ে নির্দেশিকায় লেখা তথ্য অনুসরণ করতে হবে। আধুনিক গ্লুকোমিটারে স্ট্রিপ প্রবেশ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা চালু হয়ে যায়।

৫। সুই বা ল্যানসেট (যা একটি কলমের মধ্যে থাকে) দিয়ে রোগীর হাতের আঙুলের অগ্রভাগ ফুটো করতে হবে। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন আঙুল ব্যবহার করা উচিৎ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে আসা বড় এক ফোঁটা রক্তই যথেষ্ট।

৬। রক্তের ফোঁটা পরীক্ষার স্ট্রিপের নির্দিষ্ট জায়গায় স্পর্শ করিয়ে ধরে রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় রক্তের পরিমাণ গ্লুকোমিটারভেদে ভিন্ন (০.৩ থেকে ১ মাইক্রো লিটার) হতে পারে। খুব কম বা ছোট রক্ত হলে মিটারে কোনো

ফলাফল নাও আসতে পারে। রক্ত নির্দিষ্ট সেনসরে লাগলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শোষিত হয় এবং মিটারটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পর্দায় প্রদর্শন করবে।

৭। তারিখ ও সময় দিয়ে প্রাপ্ত ফলাফল রেকর্ড করে রাখতে হবে এবং ব্যবহৃত সুই এবং স্ট্রিপ নির্দিষ্ট ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে হবে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্র গুছিয়ে রাখতে হবে।

চিকিৎসককে রিপোর্ট করার সময় গ্লুকোজের রেকর্ড চার্ট সরবরাহ করতে হবে, যাতে রেকর্ড করা গ্লুকোজের মাত্রা দেখে ডাক্তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১.২.২ ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ অথবা ডায়াবেটিস মেলিটাস (ইংরেজিতে Diabetes mellitus) একটি হরমোন সংশ্লিষ্ট রোগ। দেহে অগ্ন্যাশয় যদি যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করতে না পারে অথবা শরীর যদি উৎপন্ন ইনসুলিন ব্যবহারে ব্যর্থ হয় তাহলে যে রোগ হয় তাকে 'ডায়াবেটিস' বা 'বহুমূত্র রোগ' বলে। একে মধুমেহ রোগও বলা হয়ে থাকে। এসময় রক্তে চিনি বা শর্করার অতিরিক্ত উপস্থিতির কারণে কিছু অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, যেমন- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বার বার ক্ষুধা পাওয়া, অতিরিক্ত পিপাসা লাগা ইত্যাদি। ইনসুলিনের ঘাটতিই হল এ রোগের মূল কথা। ইনসুলিন হল অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন, যার সহায়তায় দেহের কোষগুলো রক্ত থেকে গ্লুকোজকে নিতে সমর্থ হয় এবং একে শক্তির জন্য ব্যবহার করতে পারে। ইনসুলিন উৎপাদন বা ইনসুলিনের কাজ করার ক্ষমতা-এর যেকোনো একটি বা দুটোই যদি না হয়, তাহলে রক্তে বাড়তে থাকে গ্লুকোজ। আর একে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ঘটে নানা রকম জটিলতা, দেহের টিস্যু ও বিভিন্ন অঙ্গ বিকল হতে থাকে।

প্রকারভেদ:

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ টাইপ ওয়ান (টাইপ-১) ডায়াবেটিস ও টাইপ টু (টাইপ-২) ডায়াবেটিস। টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। শরীরে তখন গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা এখনও সঠিকভাবে এর কারণ খুজে বের করতে পারেনি। তবে বিশ্বাস করা হয় যে এর পেছনে জিনগত কারণ থাকতে পারে অথবা অগ্ন্যাশয়ে ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলো নষ্ট হয়ে গেলেও এমনটি হতে পারে। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের শতকরা ১০ শতাংশ এই টাইপ ওয়ানে আক্রান্ত। অন্যদিকে টাইপ টু ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত তাদের অগ্ন্যাশয়ে যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলিন উৎপন্ন হয়না অথবা এই হরমোনটি ঠিক মতো কাজ করে না। সাধারণত মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধ ব্যক্তিরা টাইপ টু ডায়াবেটিসে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও যাদের ওজন বেশি এবং যাদেরকে বেশিরভাগ সময় বসে বসে কাজ করতে হয় তাদেরও এই ধরনের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২৫০১

ডায়াবেটিস বা বহমূত্র রোগ এর সাধারণ লক্ষণসমূহ

- ঘন ঘন ক্ষুধা পাওয়া
- অল্প কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে যাওয়া
- শরীরে শক্তির অভাব বোধ করা
- প্রচুর পরিমাণে এবং ঘন ঘন পানির পিপাসা পাওয়া
- ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হওয়া
- হঠাৎ করে ওজন খুব বেড়ে যাওয়া বা খুব কমে যাওয়া
- চোখের ঝাপসা দেখা।
- জিভ শুকিয়ে যাওয়া
- গা চুলকানো, কেটে যাওয়া ক্ষত শুকোতে বেশি সময় নেয়া প্রভৃতি।

ডায়াবেটিস বা বহমূত্র রোগের কারণসমূহ

যে কেউ যে কোনো বয়সে যেকোনো সময় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে নিম্নোক্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে-

- যাদের বংশে বিশেষ করে বাবা-মা বা রক্ত সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে।
- যাদের ওজন অনেক বেশি ও যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করেন না।
- যারা বহুদিন ধরে কর্টিসোল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করেন।
- যেসব মহিলার গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস ছিল বা যাদের পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রম থাকে।
- যাদের রক্তচাপ আছে এবং রক্তে কোলেস্টেরল বেশি থাকে।

ডায়াবেটিস-সংক্রান্ত জটিলতা

ডায়াবেটিস এর কারণে ধীরে ধীরে দেহে বিভিন্নরকম জটিলতা দেখা দেয়, যত দীর্ঘ সময় ধরে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত থাকে জটিলতা তত বাড়তে থাকে। যা কখনো কখনো মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্যে হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, কিডনিজনিত সমস্যা বা কিডনি ফেইলিওর, চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং তা থেকে অন্ধত্ব ইত্যাদি সমস্যা অন্যতম। এছাড়াও ডায়েবেটিক ফুট বা পায়ের আলসার ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আরেক আতংক, এর ফলে অনেক সময় রোগীর পাও কেটে ফেলতে হতে পারে। চর্মরোগ, শ্রবণজনিত সমস্যা, বিষণ্ণতা ইত্যাদিও হতে পারে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে সেক্ষেত্রেও বিপদ হতে পারে। আবার হাইপারগ্লাইসেমিয়া বা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রাধিক্যতায় রোগী ডায়াবেটিক কোমায় (অজ্ঞান) চলে যেতে পারে। অতিরিক্ত ঘাম, মাথা ঘোরা, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি, খিঁচুনি এমনকি এ থেকে অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে যদি সঠিক সময়ের মধ্যে তা নিয়ন্ত্রন না করা যায়।

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের প্রতিরোধ

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ-এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু করণীয় নিম্নরূপ:

- কায়িক শ্রম ও নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করা যা ওজন ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
- খাদ্য তালিকায় বেশি বেশি আঁশযুক্ত খাবার রাখা যেমন ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি ।
- শস্যদানা যেমন গম, ভুট্টা, বার্লি ইত্যাদি বা এসব থেকে তৈরি খাবার যেমন ব্রেড বা পাস্তাজাতীয় খাবার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। এটি শুধু ডায়াবেটিস নয়, অন্য আরো অনেক ধরনের রোগ যেমন- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, আরথ্রাইটিস ইত্যাদি প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- খাদ্য তালিকা থেকে শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবার বাদ দেওয়া বা খুব অল্প পরিমাণে রাখা।

এগুলো মেনে চলা ছাড়াও যাদের পরিবারে বা রক্তের সম্পর্ক আছে এমন আত্মীয়দের মাঝে ডায়াবেটিস আছে তারা ৪৫ বছর বয়সের পর নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করাতে পারেন। এছাড়াও ৪৫ বছর বয়সের আগেও যদি অতিরিক্ত ওজন থাকে তবে সেই ব্যক্তিও পরীক্ষা করাতে পারেন।

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগীর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই ডায়াবেটিস এখন এক মহামারী রোগ। মাত্র কয়েক দশক আগেও এটি ছিল খুব স্বল্প পরিচিত রোগ। অথচ বর্তমানে শুধু উন্নত বিশ্বেই নয়, বরং উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত বিশ্বেও অসংক্রামক ব্যাধির তালিকায় ডায়াবেটিস অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় এক কোটি ৩১ লাখ (সুত্র: BIRDEM) এবং প্রতি বছর গড়ে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ নতুন করে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন। স্থুলতা বা ওজন বৃদ্ধি, মেদবাহুল্য, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, মানসিক চাপ, ধুমপান ইত্যাদির করণে এ রোগে আক্রান্তের হার বাড়ছে। এ ছাড়াও অনিয়িমিত জীবনযাপন, দ্রুত নগরায়ন এবং পাশাপাশি উচ্চ শর্করা এবং কম আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। বংশগত কারণেও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। কোন ধরনের ডায়াবেটিস তার উপর নির্ভর করে নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়, মুখে খাওয়ার ঔষধ, ইনসুলিন ইত্যাদির মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডায়েট মেনে চলা এবং নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করা ডায়াবেটিস চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খাদ্য তালিকায় বেশি বেশি আঁশযুক্ত খাবার যুক্ত করা এবং চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার ত্যাগ করা জরুরি। প্রতিবেলায় একবারে বেশি করে না খেয়ে বারে বারে অল্প করে খাওয়ার অভ্যাস করতে ডায়াবেটিস রোগীদের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি 'ডি' মেনে চলা জরুরি। যেমন- ডায়েট, ডিসিপ্লিন এবং ড্রাগ। ডায়াবেটিক রোগীর খাদ্যাভ্যাসে কিছু সাধারণ নিয়মাবলি মেনে চলা উচিত, যেমন-

- তিনবেলার খাবার ছয়বারে ভাগ করে খেতে হবে এবং কোনো বেলার খাবারই বাদ দেওয়া যাবে না।
- চর্বিজাতীয় খাবার কম গ্রহণ এবং মিষ্টি জাতীয় খাদ্য পরিহার করতে হবে।

- ওজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাদ্যতালিকা মেনে চলতে হবে।
- খাবার খেতে অসুবিধা হলে রক্তে শর্করার পরিমাণ পরীক্ষা করে ঔষুধ সমন্বয় করে নিতে হবে।
- প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

ডায়াবেটিস রোগীর ব্যায়াম

ডায়াবেটিস রোগীরা সাধারণত শারীরিকভাবে সক্ষম হলে নিয়মিত হাঁটা, জগিং, ব্যায়াম ইত্যাদি করতে পারেন। ব্যায়াম রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ব্যায়ামের মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে হাঁটা। সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট করে হাঁটতে হবে। দিনের যেকোনো সময় হাঁটা যায়। এ ছাড়া ট্রেডমিলে হাঁটা বা দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, সাইক্লিং, দড়িলাফ ইত্যাদি হাঁটার বিকল্প ব্যায়াম হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এই কাজগুলো করা সক্ষম হয়না। তখন পরোক্ষ উপায়ে ব্যক্তিটিকে কিছুটা নড়া-চড়া করানো যেতে পারে। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই কাজগুলো করতে হয়।

১.২.৩ ইনসুলিন প্রদান

ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ইনসুলিন একটি প্রধানতম চিকিৎসা। বিভিন্ন ধরনের ইনসুলিন বাজারে পাওয়া যায়। রাসায়নিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে কোনোটিকে স্বল্পমেয়াদি, মাঝারি, আবার কোনোটিকে দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য সারা দিনের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করা। এসব ইনসুলিন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগীর সঙ্গে আলোচনা করে তার জন্য উপযোগী নির্দিষ্ট মাত্রা—দিনে দুই, তিন ও চারবার, আবার অনেক ক্ষেত্রে দুই ধরনের ইনসুলিনই নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। সাধারণত যখন মুখে খাওয়ার ঔষধ রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, তখনই কেবল ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন রোগীর শরীরে দেওয়া হয়ে থাকে।

ইনসুলিন কি?

ইনসুলিন আমাদের দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। পাকস্থলীর পেছনে থাকা অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস নামের একটি গ্রন্থি থেকে এটি তৈরি হয়। ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজ অর্থাৎ সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ডায়াবেটিস হলে দেহে সুগার নিয়ন্ত্রণের এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। এই ব্যাঘাত তিনভাবে ঘটতে পারে—

১. শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি না হয়ে
২. পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি হয়েও সেটি সঠিকভাবে কাজ না করলে। একে 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' বলা হয়
৩. শরীরে ইনসুলিন তৈরি হওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে

ইনসুলিন প্রোটিনজাতীয় একটি হরমোন। মুখের মাধ্যমে গ্রহণ করা হলে অন্যান্য প্রোটিনের মতো এটিও হজম প্রক্রিয়ায় ভেঙে যায়। ফলে রক্তপ্রবাহে সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে না। তাই এটি ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুল হিসেবে সেবন করা যায় না। ইনসুলিন যেন রক্তপ্রবাহে সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে সেটি নিশ্চিত করার জন্য ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়। রোগীর ডায়াবেটিসের ধরন এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুযায়ী ডাক্তার ইনসুলিনের ধরন ও ডোজ নির্ধারণ করে থাকেন ।

ইনসুলিন নেওয়ার পদ্ধতি

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেক রোগীকেই রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইনসুলিন নিতে হয়। কিন্তু সঠিক পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে অনেকে শরীরের ভুল স্থানে ভুল ডোজে ইনসুলিন নিয়ে ফেলেন। একারণে একদিকে রক্তের সুগার সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে চামড়া শক্ত হয়ে গিয়ে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে। এই অনুচ্ছেদে ইনসুলিন সিরিঞ্জ ও ইনসুলিন পেনের সাহায্যে ইনসুলিন নেওয়ার উপায় তুলে ধরা হয়েছে। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে রোগী নিজেই সহজ ও সঠিকভাবে ইনসুলিন নিতে পারবেন। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানও রোগীকে সঠিকভাবে ইনসুলিন প্রদান করতে পারবে।

ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

১. ইনসুলিন: বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক ইনসুলিন।

২. ইনসুলিন সিরিঞ্জ অথবা ইনসুলিন পেন: ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সিরিঞ্জ অথবা পেন—যেকোনো একটি ব্যবহার করা যায়।

- **ইনসুলিন সিরিঞ্জ:** এই বিশেষ সিরিঞ্জগুলো বিভিন্ন সাইজের হতে পারে। ইনসুলিনের ধরনভেদে নির্দিষ্ট সাইজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হয়। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সিরিঞ্জে ইনসুলিন নিয়ে এরপরে ইনজেকশনটি করতে হয়।
- **ইনসুলিন পেন বা কলম:** এটি দুই ধরনের হতে পারে। এক ধরনের ইনসুলিন পেন আছে যাতে আগে থেকেই ইনসুলিন ভরা থাকে। কলমের ভেতরের ইনসুলিন শেষ হয়ে গেলে কলমটি ফেলে দিতে হয়। আরেক ধরনের ইনসুলিন পেন আছে যেটির ভায়াল অথবা কার্তুজ (কার্ট্রিজ) পরিবর্তন করে বারবার ব্যবহার করা যায়।

এসব কলমের সাথে আলাদাভাবে সুঁই ব্যবহার করতে হয়। সুঁইগুলো কেবল একবার ব্যবহার করা যায়। এসব সুঁইকে কেবল ত্বকের নিচে বা সাব-কিউটেনিয়াস উপায়ে দিতে হয়— পেশী অথবা শিরার মধ্য দিয়ে দিতে হয় না বলে এগুলো বেশ ছোটো ও সরু হয়।

৩. ধারালো বস্তু ফেলার নির্দিষ্ট স্থান: হোম কেয়ার সেটিংসে ধারালো বস্তু ফেলার জন্য একটি ঝুড়ি নির্দিষ্ট করে রাখা যেতে পারে যেখানে ব্যবহৃত সুঁইটি নিরাপদে ফেলে দেওয়া যাবে। হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন রঙের কন্টেইনার থাকে। সেক্ষেত্রে লাল রঙের কন্টেইনারে ব্যবহৃত সুঁইটি ফেলতে হবে।



চিত্র ১.২: ইনসুলিন সিরিঞ্জ ও ইনসুলিন কলম পেন

ইনসুলিন সিরিঞ্জ দিয়ে ইনসুলিন দেওয়ার নিয়ম

আটটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে রোগী নিজেই ঘরে বসে ইনসুলিন সিরিঞ্জ এর সাহায্যে ইনসুলিন নিতে পারেন। আবার একই ধাপ অনুসরণ করে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানও ইনসুলিন প্রদান করতে পারে। ধাপগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

ধাপ ১: হাত ভালোভাবে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

ধাপ ২: ইনজেকশনটি শরীরের কোন জায়গায় দেওয়া হবে সেটি ঠিক করে নিতে হবে। ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হলো শরীরের চর্বিযুক্ত স্থান। যেমন: তলপেট (নাভির নিচের অংশ), উরু অথবা নিতম্ব প্রভৃতি স্থান। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা নির্বাচন করা উচিত। আগে যেখানে ইনসুলিন নেয়া হয়েছে তার থেকে অন্তত ১ সেন্টিমিটার বা আধা ইঞ্চি দূরে পরের ইনজেকশনটি দেওয়া উচিত। একই জায়গায় বারবার ইনজেকশন দিলে ওই জায়গাটি শক্ত হয়ে ফুলে যেতে পারে—যা পরবর্তীতে ইনসুলিন শোষণে ও সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দিতে পারে।

ধাপ ৩: ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ইনসুলিনটি নিতে হবে । ইনসুলিনের মেয়াদ আছে কি না সেটি বোতলের গায়ে লেখা তারিখ থেকে দেখে নিতে হবে। ইনসুলিন ব্যবহারের পূর্বে সাধারণত বোতল বা ভায়াল ঝাঁকিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে ঘোলা প্রকৃতির ইনসুলিন ব্যবহারের পূর্বে ইনসুলিন পুরোপুরি মিশে যাওয়া পর্যন্ত ভায়ালটি দুই হাতের তালুর মাঝে রেখে আলতো করে ঘুরিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের প্যাকেটে থাকা নির্দেশনাটি ভালোমতো পড়ে নিতে হবে।

ধাপ ৪: ইনসুলিন সিরিঞ্জটি মোড়ক থেকে বের করে ওপরের ক্যাপটি খুলে নিতে হবে। সিরিঞ্জটি খাড়া করে ধরে। এবার সিরিঞ্জের প্লাঞ্জার বা দণ্ড টেনে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যত ইউনিট ইনসুলিন নিতে হবে ততটুকু (তত cc বা ml) বাতাস সিরিঞ্জে প্রবেশ করাও। ইনসুলিনের ধরনভেদে নির্দিষ্ট সাইজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হয়। তা নাহলে ভুল ডোজে ইনসুলিন নেওয়ার মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ইনসুলিন নেওয়ার সময়ে ইউনিট অনুযায়ী উপযুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। ডাক্তারের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিতে হবে।

ধাপ ৫: ইনসুলিনের ভায়ালটি খাড়া করে ধরে বোতলের ভেতরে সিরিঞ্জের সুঁইটি পুরোপুরি ঢুকিয়ে দিতে হবে। এরপর সিরিঞ্জের প্লাঞ্জার বা দণ্ড চেপে সিরিঞ্জের ভেতরে থাকা বাতাস ভায়ালে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এতে করে সিরিঞ্জে ইনসুলিন তুলতে সুবিধা হবে। এবার ভায়ালটি উল্টো করে ধরে নির্ধারিত ইউনিটের চেয়ে সামান্য বেশি ইনসুলিন সিরিঞ্জে টেনে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ভায়ালের ভেতরে সুঁইয়ের মাথার চারিদিকে যেন ইনসুলিন থাকে এবং কোনো বাতাস না থাকে।

ধাপ ৬: এরপর এমনভাবে সিরিঞ্জটি ধরতে হবে যেন সুঁই ওপরে ও প্লাঞ্জার নিচে থাকে। সিরিঞ্জের গায়ে আলতো করে কয়েকটি টোকা দিলে ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে তা ওপরের দিকে উঠে আসে। এবার যতক্ষণ পর্যন্ত সুঁইয়ের মাথায় ইনসুলিন না দেখা যায় ততক্ষণ সিরিঞ্জের নিচের দিকে থাকা প্লাঞ্জারে ধীরে ধীরে চাপ দিতে হবে।

এই কাজটিকে বলা হয় 'প্রাইমিং'। সুঁই ও সিরিঞ্জের ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে তা এই পদ্ধতিতে বের করা যায়। ফলে ডোজ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। এভাবে সিরিঞ্জে যেন কেবল নির্ধারিত ডোজের ইনসুলিন থাকে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

ধাপ ৭: যেখানে ইনজেকশনটি নিবে সেই স্থান পরিষ্কার ও শুকনো আছে কি না সেটি নিশ্চিত ক তে হবে। এক্ষেত্রে এলকোহল সোয়াব ব্যবহার করা যেতে পারে। ইনজেকশন দেওয়ার আগে ত্বকে আস্তে চাপ দিয়ে উঠিয়ে নিতে পার। এবার সমকোণে বা খাড়াভাবে (৯০ ডিগ্রী কোণে) সুঁইটি শরীরে পুরোপুরি প্রবেশ করাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো সিরিঞ্জ খালি না হয় ততক্ষণ প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে।

ধাপ ৮: সুঁইটি বের করে ফেলার আগে ইনসুলিন যেন শরীরে প্রবেশ করার যথেষ্ট সময় পায় সেজন্য এক থেকে দশ পর্যন্ত গোনা যেতে পারে। ত্বকে চাপ দিয়ে রাখলে তা সরিয়েনিতে হবে। এবার সুঁইটি বের করে ফেল। অবশেষে সুঁইসহ সিরিঞ্জটি নিরাপদ স্থানে ফেলে দাও।

ইনসুলিন পেন বা কলম দিয়ে ইনসুলিন দেওয়ার নিয়ম

ইনসুলিন পেন এর সাহায্যে সাতটি সহজ ধাপে ইনসুলিন নেওয়া যায়। ধাপগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

ধাপ - ১ এবং ২ পূর্বের ন্যায়

ধাপ ৩: ইনসুলিন পেন এর বাইরের ও ভেতরের ক্যাপ খুলে এতে সুঁইটি লাগিয়ে নাও। ডায়াল ঘুরিয়ে দুই ইউনিটে নিয়ে আসতে হবে। এরপর পেনটিকে সোজা করে ধর। যতক্ষণ পর্যন্ত সুঁইয়ের মাথায় ইনসুলিন না দেখা যায় ততক্ষণ পেনের পেছনে থাকা প্লাঞ্জারে ধীরে ধীরে চাপ দাও। এই কাজটিকে বলা হয় 'প্রাইমিং'।

ধাপ ৪: এবার ডায়াল ঘুরিয়ে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডোজটি বাছাই কর। যেখানে ইনজেকশনটি নিবে সেই স্থান পরিষ্কার ও শুকনো আছে কি না তা নিশ্চিত কর।

ধাপ ৫: সমকোণে বা খাড়াভাবে (৯০ ডিগ্রী কোণে) সুঁইটি শরীরে প্রবেশ করাও। ইনজেকশন দেওয়ার আগে ত্বক আস্তে চাপ দিয়ে উঠিয়ে নিতে পারো। যতক্ষণ পর্যন্ত ডায়ালটি জিরোতে (০) ফেরত না যায়, ততক্ষণ প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ধরে রাখ।

ধাপ ৬: সুঁইটি সরানোর আগে ইনসুলিন যেন শরীরে প্রবেশ করার যথেষ্ট সময় পায়, সেজন্য ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনে নাও। ত্বকে চাপ দিয়ে রাখলে তা সরিয়ে নাও।

ধাপ ৭: সুঁইটি সরিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলে দাও।

ইনসুলিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: অনেকেই ইনসুলিন ইনজেকশন শুরু করার আগে এটি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন। কারও কারও সুঁই দেখে ভয় লাগতে পারে, কেউ কেউ অস্থির বোধ করতে পারে, ব্যথা নিয়ে চিন্তিত হতে পারে—এমনকি অনেকে অন্যদের সামনে ইনজেকশন নিতে লজ্জা অথবা ভয় পেতে পারে। এই ধরনের অনুভূতি হওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের দায়িত্ব হচ্ছে রোগীকে সঠিকভাবে কাউন্সেলিং করা। পরিচিত কোনো আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মী অথবা প্রতিবেশী যদি ইনসুলিন ব্যবহার করে থাকে তাহলে তাদের সাথেও এই ব্যাপারে রোগীকে কথা বলানো যেতে পারে। ডায়াবেটিস ও ইনসুলিন নিয়ে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, তাই এসব আলোচনা থেকে রোগী তার নিজের জন্য উপযোগী কিছু পরামর্শ পেতে পারে। অন্যান্য ঔষধের মতোই ইনসুলিন নিলে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন:

- মাথাব্যথা, বমি বমি লাগা, সর্দিজ্বর অথবা ফ্লু এর মতো লক্ষণ
- হাইপোগ্লাইসেমিয়া: ইনসুলিনের সবচেয়ে পরিচিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো হাইপোগ্লাইসেমিয়া।রক্তে গ্লুকোজ তথা সুগারের পরিমাণ ন্যূনতম স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কমে গেলে তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয়। অনেকে একে সংক্ষেপে 'হাইপো' হিসেবে চেনেন। মূলত ইনসুলিন নিতে হয় এমন ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দেয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে ইনসুলিন নিলে অথবা ইনসুলিন নেওয়ার পরে খাবার না খেলে এই অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। ঘন ঘন হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার অন্যতম কারণ হলো ভুল ডোজে ইনসুলিন নেওয়া। তাই এমন ক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে কথা বলে সঠিক ডোজ এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।
- ইনজেকশনের জায়গায় কালশিটে দাগ পড়া: ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার সময়ে চামড়ার নিচের কোনো ছোটো রক্তনালিকায় আঘাত লাগলে তা থেকে ত্বকে কালশিটে দাগ পড়তে পারে। যারা নিয়মিত ইনসুলিন নেয় তাদের ইনজেকশন নেওয়ার পদ্ধতিতে ত্রুটি না থাকলেও, কখনো কখনো এমন কালশিটে হতে পারে। এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে ইনসুলিন দেওয়া চালিয়ে যেতে হবে এবং রোগীকেও সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল সুঁইয়ের সাইজ পরিবর্তন করে অথবা প্রতিবার ইনসুলিন নেওয়ার পরে ব্যবহৃত সুঁই পরিবর্তন করে এমন কালশিটে দাগ পড়া কমিয়ে আনা যায়।
- ইনজেকশনের জায়গা ফুলে যাওয়া: একই জায়গায় বারবার ইনসুলিন নেওয়া হলে জায়গাটি শক্ত হয়ে ফুলে যায়। একে মেডিকেলের ভাষায় 'লাইপো-হাইপারট্রফি' বা সংক্ষেপে 'লাইপো' বলা হয়। এমন ফোলা ইনসুলিন শোষণে ও সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। তাই প্রতিবার ইনসুলিন নেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গা বেছে নিতে হবে। আগেরবার যেখানে ইনসুলিন নেওয়া হয়েছে সেটি থেকে অন্তত এক সেন্টিমিটার বা আধা ইঞ্চি দূরে পরের ইনজেকশনটি দেওয়া উচিত। বেশ কিছুদিন পার হওয়ার পরেও 'লাইপো' বা ফোলা সেরে না উঠলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

১.৩ স্যাম্পল কালেকশন বা নমুনা সংগ্রহ

আমরা জানি যে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমেই একজন সুস্থ অথবা অসুস্থ রোগীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। সঠিক রোগ নির্নয় বা ডায়গনোসিস এবং চিকিৎসার সিদ্ধান্তগুলো এই পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভুলতার উপর নির্ভর করে। তাই সঠিক ফলাফলের জন্য যথাযথভাবে রোগীকে **প্রস্তুতকরন** ও **নমুনা সংগ্রহ** একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তাই যে সমস্ত সেটিংসে নানা ধরনের নমুনা সংগ্রহ করা হয় সে সমস্ত জায়গায় দায়িত্বে থাকা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের বর্তমান প্রচলিত জীবাণুমুক্ত কৌশলগুলো অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। যেমন, সুঁচ, সিরিঞ্জ, ক্যাথেটার, কলোস্টমি ব্যাগ, বাটারফ্লাই নিডল, পিপিই এবং অন্যান্য সরঞ্জাম জীবানুমুক্তকরন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সতর্কতামূলক জ্ঞান থাকা জরুরি। মনে রাখতে হবে নমুনা সংগ্রহ করা হয় এমন সব জৈবিক উপাদানকে বিষাক্ত উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে এর বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতি সমূহ গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। রোগীদের এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের উভয়ের নিরাপত্তার জন্য নমুনা সংগ্রহকারী এবং প্রস্তুতির সাথে জড়িত সকলকেই সঠিক মান বজায় রেখে এই কাজটি সম্পন্ন করতে হয়।

স্যাম্পল বা নমুনা: ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য কোনো ব্যক্তির শরীর থেকে যে পদার্থ নেওয়া হয় তাকে নমুনা (Specimen) বলে। যেমন: রক্ত, মল, কফ, প্রসাব, সোয়াব ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল: চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসংখ্য পরীক্ষা রয়েছে এবং যেগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ধরনের নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। তবে সাধারণত যে সমস্ত নমুনাসমূহ সংগ্রহ করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

ক) রক্তের নমুনা: এটি করার জন্য প্রশিক্ষিত কেউ (সাধারণত একজন ফ্লেবোটোমিস্ট, ডাক্তার বা নার্স) দ্বারা রক্তনালী (কৈশিক জালিকা, শিরা এবং কখনও কখনও ধমনী) থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের টিউব ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু রক্তের নমুনা আঙুলের খোঁচা দিয়ে পাওয়া যেতে পারে যা শুধুমাত্র এক ফোঁটা রক্ত দিয়েই করা যায়, যেমন গ্লুকোজ পরীক্ষা।	 চিত্র ১.৩: বাটারফ্লাই সুচ ব্যবহার করে রক্তের নমুনা সংগ্রহ
খ) মল সংগ্রহ: ব্যাক্তিকে টয়লেটে পাঠিয়ে সাধারণত এই নমুনা নিজেকেই সংগ্রহ করতে বলা হয়। তবে মূমূর্ষ রোগীর কাছ থেকে সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি ভিন্নতর হতে পারে। মলের সাথে যাতে প্রসাব মিশ্রিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখাটাই এই নমুনা সংগ্রহের মূল সাবধানতার বিষয়। এই অধ্যায়ে পরবর্তীতে মল সংগ্রহের পদ্ধতি আলোচনা করা হবে।	 চিত্র ১.৪: মল সংগ্রহের জন্য ব্যাবহৃত কন্টেইনার বা কৌটা।

গ) প্রসাবের নমুনা: এই নমুনা সংগ্রহের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীকে একটি পাত্রে বা কন্টেইনারে প্রস্রাব ধরার জন্য বলা হয়। কন্টেইনারে প্রসাব ধারনের পূর্বে মূত্রনালীর বাইরের অংগের সংস্পর্শের দ্বারা যাতে নমুনা দূষিত না হয় সে জন্যে রোগী কীভাবে যৌনাঙ্গ পরিষ্কার করবে সে বিষয়ে নির্দেশনাবলি দেওয়া হয়। তাছাড়া ব্যক্তিকে কিছু প্রসাব নিঃসরণ করার পর মাঝ পথে কিভাবে কন্টেইনারে প্রসাব সংগ্রহ করবে সে ব্যাপারেও স্বাস্থ্যজ্ঞান প্রদান করা হয়। রোগীর অবস্থাভেদে কখনও কখনও ক্যাথেটার থেকেও বিশেষ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে প্রসাবের নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।	 চিত্র ১.৫: ক্যাথেটার থেকে সিরিঞ্জের মাধ্যমে প্রসাবের নমুনা সংগ্রহ।
ঘ) কফ সংগ্রহ: এই নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে রোগীকে যতটা সম্ভব ফুসফুসের ভিতর দিক থেকে কাশির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। একজন স্বাস্থ্যকর্মী এ কাজটি করার জন্য রোগীকে সহায়তা করতে পারেন। কোনো কিছু পান অথবা খাবারের পূর্বে কফ সংগ্রহের জন্য সকাল বেলাকেই মোক্ষম সময় বলে বিবেচনা করা হয়। এ সময় রোগীকে কন্টেইনারে কফ দেওয়ার আগে ধীরে ধীরে কয়েকবার গভীর শ্বাস নেওয়ার পরে কাশি দিতে বলা হয়। সংগৃহীত কফ অপেক্ষাকৃত ঘন হওয়া উচিত যেন সেটা সাধারণ লালা মিশ্রিত না হয়।	 চিত্র ১.৬:ব্যক্তি নিজে নিজে কফ সংগ্রহে অংশগ্রহণ করছেন।
ঙ) ন্যাসোফেরেঞ্জিয়াল সোয়াব (Nasopharyngeal Swab) সংগ্রহ : এটি ক্লিনিকাল পরীক্ষার জন্য একটি পদ্ধতি যেটি রোগীর অনুনাসিক ক্ষরণ এর পিছনে নাক এবং গলা থেকে সোয়াব সংগ্রহের মাধ্যমে করা হয়। নাকের শেষ প্রান্তে গিয়ে গলার পিছনের দেওয়াল (Nasopharynx) থেকে একটি প্লাস্টিকের সূতি সোয়াব বেষ্টিত সরু কাঠি দিয়ে এই নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। এটি নাকে প্রবেশের সাথে সাথেই রোগী হাঁচি দিতে শুরু করে। যার ফলে নাকের শেষ পর্যন্ত যাওয়া এবং সেখানে স্টিকের তুলা ভেজানোর জন্য নূন্যতম ২ সেকেন্ড স্টিকটি ধরে রাখতে হয়। এই ক্ষেত্রে যিনি নমুনা নিবেন তাকে ভালোভাবে পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুয়েপমেন্ট (PPE) পরতে হয় ইনফেকশন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।	 চিত্র ১.৭: নাসোফেরেঞ্জিয়াল সোয়াব সংগ্রহ

১.৪ রোগীকে সঠিক পজিশনিং ও স্থানান্তর করা

পজিশনিং বলতে একজন রোগীকে বিছানায় বা অন্য কোথাও সঠিকভাবে শোয়ানো কিংবা বসানোকে বুঝানো হয় যাতে করে তার শরীরের এলাইনমেন্ট স্বাভাবিক থাকে এবং রোগীর সর্বোচ্চ আরাম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। আমরা সুস্থ মানুষেরাও সাধারণত একভাবে বেশিক্ষণ শুয়ে বা বসে থাকতে পারিনা। হাতে-পায়ে ঝিম ঝিম ধরাসহ আরো অনেক সমস্যা সামনে এসে হাজির হয়। ঠিক তেমনি একজন রোগী যিনি শারীরিক বা মানসিক সমস্যাগ্রস্ত হয়ে কেয়ারগিভারের সহায়তা নিচ্ছেন, তাকেও আমাদের উচিৎ হবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট নিয়মে পজিশনিং করা। বিশেষ করে অজ্ঞান রোগী কিংবা সম্পূর্ণরূপে বিছানায় শয্যাশায়ী রোগীর (Bed Ridden Patient) ক্ষেত্রে এটি অতীব জরুরি। অন্যথায় প্রেসার সোরের মত মারাত্মক অসুবিধা তৈরি হতে পারে। আবার নানা প্রয়োজনে আমাদেরকে হাসপাতালে বা বাসাবাড়িতে থাকা রোগীকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করতে হয়। যেমন; টয়লেট করানো, গোসল করানো, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। হুইলচেয়ার থেকে বিছানা, বিছানা থেকে হুইলচেয়ার, চেয়ার থেকে হুইলচেয়ার এরকম অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে। সঠিকভাবে স্থানান্তর করতে না পারলে রোগী পড়ে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। একজন রোগীকে সঠিকভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করা কেয়ারগিভারের অত্যাবশ্যকীয় একটি দক্ষতা। এই অংশে রোগীকে সঠিকভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করার উপায় অনুশীলন করার পাশাপাশি হুইলচেয়ারের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

১.৪.১ রোগীকে সঠিক পজিশনে রাখা ও স্থানান্তর করার গুরুত্ব

কখন করতে হয়: যখন একজন রোগী-

- শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম হয়।
- শারীরিক কোনো সমস্যাগ্রস্ত কিংবা তীব্র ব্যথা থাকে যেক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হয়।
- প্রেসার আলসারে আক্রান্ত থাকেন কিংবা প্রেসার আলসারে আক্রান্ত হবার ঝুকিতে থাকেন।
- মস্তিস্কের সমস্যায় ভুগেন যেক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যহত হচ্ছে।
- রেস্টলেস কিংবা অস্থীর প্রকৃতির।
- দাঁত মাজা, গোসল করা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজকর্ম বিছানাতেই সম্পন্ন করতে বাধ্য হচ্ছেন কিংবা নিজে নিজে করতে পারছেন না।
- কোন নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিংবা অপারেশন কিংবা অন্য কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবেন।

গুরুত্ব:

- সঠিক পজিশনিং ও স্থানান্তর রোগীকে শরীরবৃত্তীয়ভাবে স্বক্রিয় রাখে। রোগীর রক্ত ও স্নায়ুবিক চলাচলকে স্বাভাবিক রাখে।
- প্রেসার সোর বা প্রেসার আলসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- সঠিভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করার মাধ্যমে রোগীকে আরাম ও স্থিরতা প্রদান করা সম্ভব, এতে রোগী নির্ভার অনুভব করে
- সঠিক পজিশনিং ডাক্তার, নার্সদের কিছু কিছু পদ্ধতি সম্পন্ন করতে সুবিধা প্রদান করে
- রোগীর পড়ে যাওয়ার আশংকা কমায় এবং রোগীর নিরাপত্তা জোরদার করে। এতে রোগীর বিভিন্ন ইনজুরির ঝুঁকি হ্রাস পায়।
- সঠিকভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করা গেলে রোগী অনেক কাজ নিজে নিজেই সম্পন্ন করতে পারে। যেমন: দাঁত মাজা ও মুখ ধোয়া, খাবার খাওয়া প্রভৃতি। এতে রোগীর স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়।

প্রেসার আলসার:

রোগী শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম হলে একটি খুব জটিল সমস্যা তৈরি করতে পারে যার নাম প্রেসার আলসার। একে প্রেসার সোর বা বেড সোর নামেও অভিহিত করা হয়। ইহা এক ধরনের ক্ষত যাহা রোগীর শরীরে বিছানা, ম্যাট্রেস বা অন্য কোনো শক্ত কিছুর সাথে দীর্ঘদিন চাপের ফলে সৃষ্টি হয়। সাধারণত রোগীর দেহের হাড় সংশ্লিষ্ট অংশে (Bony Prominense; উচ্চারণ: বোনি প্রমিনেন্স) এটি বেশি হয়ে থাকে। এ ধরনের কিছু স্থানের উদাহরণ হচ্ছে; মাথার পিছনের অংশ, দুই কাঁধের শক্ত অংশ, কনুই, নিতম্ব, পুচ্ছদেশীয় অংশ, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি ও হিল প্রভৃতি। এ ধরনের অংশ যখন দীর্ঘক্ষণ চাপ খেয়ে থাকে, তখন আস্তে আস্তে এ সমস্ত অংশের টিস্যুতে অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত হয়, যার ফলে টিস্যুগুলো মরে যেতে থাকে। সুস্থ স্বাভাবিক চামড়ায় এভাবে ফাটল ধরে যার থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে প্রেসার সোর বা চাপ ক্ষত।



(ক) মাথার পিছনের অংশ; শোল্ডার ব্লেড; কোমরের নিচ পায়ের হিল **(খ) কান কাঁধ; কোমর; হাঁটু; পায়ের গোড়ালি**

চিত্র ১.৮: প্রেসার আলসারের সচরাচর জায়গা

প্রেসার আলসারের পর্যায়: প্রেসার আলসার সাধারণত ৪টি পর্যায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা:

প্রথম পর্যায়: জায়গাটি লালচে, ফ্যাকাশে অথবা কালচে বর্ন ধারন করে এবং চাপ বন্ধ করার ১ মিনিটের মধ্যে তার স্বাভাবিক রঙে ফিরে আসেনা। জায়গাটি আশেপাশের অংশগুলো থেকে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি শক্ত, নরম, উষ্ণ বা ঠান্ডা, অথবা বেশি ব্যথাদায়ক থাকতে পারে। ত্বকের রঙ কালো এরকম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি শুরুর দিকে বুঝতে পারা একটু কঠিন বটে।	 **চিত্র ১.৯: চতুর্থ পর্যায়ের একটি প্রেসার আলসার**

দ্বিতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ে জায়গাটিকে গোলাপি বা লালচে রঙের টিস্যুসহ একটি অগভীর খোলা ক্ষতের মত দেখাবে। মাঝে মাঝে এটিকে ফোস্কার মতোও দেখাতে পারে।

তৃতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ে আরো অধিক টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চামড়ার নিচে অবস্থিত চর্বি এ পর্যায়ে দৃশ্যমান হয়।

চতুর্থ পর্যায়: একটি গভীর গর্ত তৈরী হয়। মাংশপেশি কিংবা হাড় দৃশ্যমান হতে পারে।

প্রেসার আলসারের ঝুঁকিসমূহ:

১। ইমোবিলিটি বা অনড় অবস্থা
২। অধিক বয়স
৩। ভঙ্গুর ও শুকনো ত্বক
৪। আর্দ্র ত্বক; যখন একটি ত্বক অপর ত্বকের সাথে কিংবা কোনো আর্দ্র বিছানার চাদরের সাথে লাগানো থাকে।
৫। অপুষ্টি
৬। নিম্ন মানের হাইড্রেশন; যথেষ্ট পরিমাণ পানি পান না করা
৭। নিম্ন মানের রক্ত সঞ্চালন
৮। নিম্ন মানের অক্সিজেন সরবরাহ প্রভৃতি।

প্রেসার আলসার প্রতিরোধে করণীয়:

১। ত্বকের যত্ন করা
২। রোগীকে নড়াচড়া করা এবং নিজে নিজে নড়াচড়া করতে অনুপ্রেরণা দেওয়া
৩। ত্বকে ফাটল ধরার বিভিন্ন লক্ষণ পরীক্ষা করা
৪। নিয়মিত টয়লেট ব্যবহারে সহায়তা করা এবং পেরিনিয়াল কেয়ার প্রদান করা
৫। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার ও পানি পানে উৎসাহিত করা
৬। নিয়মিতভাবে পজিশন বা রোগীর অবস্থান পরিবর্তন করা এবং ঘর্ষণ বা অন্য কোনো আঘাত যেনো রোগী না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা। সাধারণত প্রতি ২ ঘন্টা পর পর পজিশন বা রোগীর অবস্থানের পরিবর্তন করতে হয়।
৭। পরিষ্কার, পরিপাটি কাপড়চোপড় এবং বিছানার চাদর নিশ্চিত করতে হবে।

পজিশনিং এর প্রকারভেদ:

প্রেসার আলসার প্রতিরোধে সঠিক পজিশনিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক ধরনের পজিশনিং এর কথা বলা আছে। এখানে কয়েকধরনের পজিশনিং যেগুলো একজন কেয়ারগিভারকে প্রায়শই সম্পন্ন করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

২০২১

সুপাইন পজিশন

এটি মুলত চিত করে শোয়ানো। রোগী তার পিঠ বিছানার সমান্তরালে রেখে মাথা উপর দিকে দিয়ে সোজা হয়ে শুয়ে থাকেন। বাড়তি আরাম ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন বালিশ, ম্যাট্রেস, সাইড রেইল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



প্রোন পজিশন

রোগীকে তার বুক-পেট বিছানার সাথে রেখে এবং মাথা একপাশে দিয়ে সোজা করে শোয়ানো হয়। বাড়তি আরাম ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে বালিশ, ম্যাট্রেস, সাইড রেইল ইত্যাদি।



লেটারাল পজিশন

রোগীকে একপাশে কাত করে শোয়ানো হয়, যেক্ষেত্রে তার এক পা আরেক পায়ের উপরে থাকে। কক্কিজিয়াল রিজিওন বা পুচ্ছদেশীয় হাড়ের উপর চাপ কমাতে এই পজিশন উপকারী। এটি লেফট ও রাইট লেটারেল পজিশন এই দুইভাবে বিভক্ত।



সিম'স পজিশন

এক্ষেত্রে রোগীকে সুপাইন ও প্রোন এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটি অবস্থানে রাখা হয় যেক্ষেত্রে রোগীর এক পাশের হাত-পা সামনের দিকে এবং অন্য পাশের হাত-পা পিছনের দিকে থাকে। কোনো অবস্থাতেই হাত যেনো রোগীর শরীরের নিচে চাপা না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।



ফাওলার্স পজিশন রোগীর বিছানার মাথার দিকের অংশ ৪৫ ডিগ্রি কোণে উপরের দিকে উঁচিয়ে রাখা হয়। কোমরের উপর ভর দিয়ে রোগী এক্ষেত্রে আধশোয়া অবস্থায় থাকে। রোগীকে বিছানায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য এটি একটি সুবিধাজনক পজিশন।	
সেমি-ফাওলার্স পজিশন রোগীর বিছানার মাথার দিকে অংশ ৩০ ডিগ্রি কোণে উপরের দিকে উঁচিয়ে রাখা হয়। যেসকল রোগীর হৃৎপিণ্ড কিংবা ফুসফুসের সমস্যা আছে এবং যাদের নল দিয়ে তরল খাবার দিতে হয়, তাদেরকে সাধারণত এই ধরনের পজিশনে রাখা হয়।	
ট্রেন্ডলেনবার্গ পজিশন এক্ষেত্রে রোগী মাথা পায়ের নিচে নামিয়ে রোগীকে চিত্রের ন্যায় সমান্তরালে রাখতে হয়। হাইপোটেনশন কিংবা এধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে এ ধরনের পজিশনিং কার্যকরি। এটি ভাইটাল অরগানসমূহে রক্ত চলাচলকে বাড়িয়ে দেয়, যেমন মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড।	

চিত্র ১.১০: বিভিন্ন প্রকার পজিশনিং

সঠিকভাবে পজিশনিং পদ্ধতি:

পজিশনিং করার সময় রোগী ও কেয়ারগিভার উভয়েরই ইনজুরি এড়ানোর জন্য এ কাজটি অত্যন্ত সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। উপরোল্লেখিত পজিশনগুলোর কিছু নির্দিষ্ট উপায় থাকলেও যেকোনো পজিশনিং এর ক্ষেত্রেই এর মূলনীতি আসলে একই রকম। যেমন:

১। পদ্ধতিটি রোগীকে ব্যাখ্যা করা ও বুঝিয়ে বলা। কি করতে যাওয়া হচ্ছে সেটি রোগীকে শুরুতেই বুঝিয়ে বলতে হবে। পাশাপাশি সেটি কেন করা হচ্ছে, করলে কি উপকার হবে আর না করলে কি হতে পারে তাও নরম সুরে বলতে হবে। রোগীর কাছ থেকে এভাবে ভালো সম্পর্কের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে পজিশনিং করলে সেটি রোগী অনুসরণ করে থাকে।

২। রোগীকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে রোগী তার সাধ্যমত সহযোগীতা করে। আগেই ঠিক করে নিতে হবে রোগী কি কিছুটা সহায়তা করতে পারবে নাকি একেবারেই পারবেনা। যদি মনে হয় রোগীর পক্ষে সহযোগীতা করা সম্ভব তাহলে সেটি করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে করে রোগীর স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়।

৩। আর যদি মনে হয় যে রোগীর পক্ষে কোনোপ্রকার সহযোগীতা করা সম্ভব নয়, তাহলে প্রয়োজনে অন্য কারো সাহায্য নিতে হবে। কোনভাবেই রোগীকে মাটিতে ফেলে দেওয়া যাবেনা। অনেক সময় খুব ভারি রোগীকে উত্তোলন, পজিশনিং কিংবা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৪। সম্ভব হলে নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন: বেড বোর্ড, স্লাইড বোর্ড, বালিশ, পেশেন্ট লিফ্ট, স্লিংস, হোয়েস্ট ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে পজিশনিং ও ট্রান্সফারের কাজটি সহজ হয়।

৫। রোগীর বিছানা প্রয়োজন মত উপর-নিচে এডজাস্ট করে নিতে হবে। বর্তমানে রোগীর বিছানা সাধারণত মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক হয়ে থাকে যেখানে সুইচ বোর্ডের বাটন টিপে প্রয়োজন মত ৪৫ বা ৩০ ডিগ্রি কোণে মাথার বা পায়ের দিকে বিছানা এডজাস্ট করে রোগীকে পজিশন করা যেতে পারে। আবার সাধারণ বিছানার ক্ষেত্রে ঘাড়ের নিচে ও পিঠে অতিরিক্ত বালিশ বা ম্যাট্রেস দিয়ে মাথার দিকটা উঁচু করা যেতে পারে। পায়ের নিচে বালিশ দিয়ে পা গুলোকে উপরে তুলে পজিশনিং করা যায়।

৬। নিয়মিত পজিশন বা অবস্থানের পরিবর্তন করা। মনে রাখতে হবে, যেকোনো পজিশনই রোগীর জন্য ক্ষতিকর যদি সেটি অনেক লম্বা সময় ধরে রাখা হয়। তাই খেয়াল করে প্রতি দুই ঘন্টা পর পর রোগীর অবস্তার পরিবর্তন করিয়ে দিতে হবে। এতে করে রোগীর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পায় এবং প্রেসার আলসারের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৭। রোগীর শরীর যাতে দেওয়ালে বা বিছানায় ঘষা না খায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রোগী স্থানান্তর করার সময় রোগীকে ভারসহ উত্তোলন করতে হবে যাতে করে কোথাও ঘষা লেগে রোগীর ক্ষতি না হয়।

৮। নিজের ও রোগীর উভয়েরই সঠিক বডি মেকানিক্স বা এনাটমিক্যাল এলাইনমেন্ট বজায় রাখতে হবে।

- নিজেকে যথাসম্ভব রোগীর কাছাকাছি রাখতে হবে।
- প্রয়োজনে নিজের হাঁটু ভাঁজ করতে হবে এবং পা দুটো যথেষ্ঠ পরিমাণ ফাঁকা করে দাঁড়াতে হবে।
- রোগীর পজিশনিং, লিফটিং বা ট্রান্সফারের সময় হাতের বা পায়ের উপর ভর দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কোমরের উপর ভর দেওয়া যাবেনা। এতে নিজের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তৈরি হতে পারে। যেটি সাধারনত আর্গোনোমিক হ্যাজার্ড হিসেবে পরিচিত।
- রোগী নড়ানোর সময় পেটের মাংশপেশিকে শক্ত করে রাখা যেতে পারে। এতে বলপ্রয়োগ সহজ হয়।

১.৪.২ রোগীকে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরের উপায়

রোগীকে নানা প্রয়োজনে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হয়। যেমন: টয়লেট করানো, গোসল করানো, খাবার খাওয়ানো, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি। শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম বয়স্ক ব্যক্তি বা যে কোনো বয়সের রোগীকে বিভিন্ন পরিপূরক যন্ত্রের সাহায্যে এই স্থানান্তরের কাজটি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে আরেকটু বিষদভাবে জানতে পারবো। এই অংশে আমরা রোগীকে কেবলমাত্র বিছানা থেকে হুইলচেয়ার ও হুইলচেয়ার থেকে বিছানায় স্থানান্তরের কৌশল অনুশীলন করবো।

বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তর:

রোগীর মাথা ও কাঁধ বিছানার উপরে উত্তোলন করা:

প্রস্তুতি-

১। সঠিকভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

২। প্রয়োজনীয় উপকরন সংগ্রহ করতে হবে

৩। রোগীকে সঠিকভাবে সম্ভাষণ জানিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

৪। রোগীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

৫। রোগীকে পদ্ধতিটি বর্ণনা করতে হবে এবং সাধ্যমত সহায়তা করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৬। প্রয়োজন অনুযায়ী বিছানার উচ্চতা এডজাস্ট করে নিতে হবে যাতে করে স্বাচ্ছন্দের সাথেই কাজটি করা যায়। বিছানার চাকা অবশ্যই লক করে নিতে হবে।

৭। সম্ভব হলে রোগীকে সুপাইন পজিশনে রাখতে হবে।

পদ্ধতি-

১। বিছানার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আনুমানিক ১২ ইঞ্চি ফাঁকা রেখে এক পায়ের সামনে আরেক পাঁয়ের পজিশন নিতে হবে

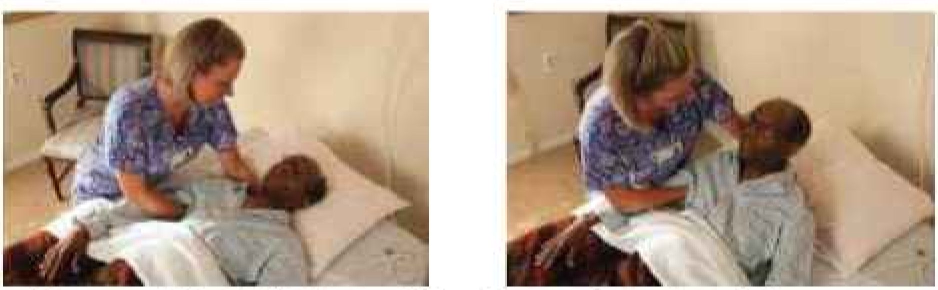
২। রোগী যদি সক্ষম হয় তাহলে তাকে তার হাত কেয়ারগিভারের হাতের নিচে রেখে শক্ত করে আকড়ে ধরতে বলতে হবে। আর যদি না পারে তাহলে কেয়ারগিভারকে একাই রোগীর হাত শক্ত করে ধরতে হবে।

৩। এক হাত দিয়ে রোগীর নিকটবর্তী হাত শক্ত করে ধরে অপর হাত দিয়ে রোগীর কাঁধে শক্ত করে সাপোর্ট দিতে হবে (চিত্রের ন্যায়)।

৪। এবারে নিজের দুই পায়ে ভর দিয়ে দুই হাতের সাহায্যে রোগীর মাথা উপরে উত্তোলন করতে হবে। রোগীকে সাধ্যমত সহযোগীতা করার কথা বলতে হবে।

৫। কাঁধের নিচে হাত দিয়ে রোগীর পিঠে ও ঘাড়ে বালিশ বা কুশন রেখে উচ্চতা ঠিক করে নিতে হবে যাতে রোগী তার নতুন পজিশনে আরামদায়কভাবে বসতে পারেন। এই কাজটি ইলেকট্রিক বেডেও খুব সহজেই করা যায়।

৬। এবার রোগীকে সতর্কতার সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী ফাওলার্স, সেমি-ফাওলার্স বা অন্য কোন পজিশনে বিছানায় রাখতে হবে।



চিত্র ১.১১: রোগীর মাথা বিছানা থেকে উঠিয়ে ফাউলার্স পজিশনে রাখার কৌশল।

সমাপ্তি-

১। রোগীর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, আরামদায়ক অবস্থা ও শারীরিক অবস্থান বজায় রাখতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী বিছানার উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে হবে যাতে করে কেয়ার প্ল্যান অনুযায়ী নির্ধারিত সেবাটি খুব সহজেই প্রদান করা যায়।

৩। কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে হবে।

৪। হাত ধুয়ে নিতে হবে।

৫। রেকর্ড সম্পাদন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

৬। রোগীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মটি সম্পাদন করতে হবে।

রোগীকে বিছানায় একপাশ থেকে অন্য পাশে সরানো: প্রস্তুতি ও সমাপ্তি আগের মতই। পার্থক্য কেবল প্রক্রিয়া গত। মৌলিক কিছু ধাপ নিম্নরূপ:

১। বিছানার উচ্চতা একটু নামিয়ে নিতে হবে এবং রোগীকে মাথা উঁচু করার জন্য বলতে হবে। যদি রোগী করতে সক্ষম না হয় তাহলে পূর্বের পদ্ধতি অনুশীলন করে আগে রোগীর মাথা উঁচিয়ে পিছনে থেকে বালিশটি সরিয়ে নিতে হবে।

২। একই নিয়মে বিছানার দিকে মুখ করে দুই পায়ের পজিশন ঠিক করে দাঁড়াতে হবে।

৩। রোগীর দুই হাত চিত্রের ন্যায় বুকের উপর ক্রস করে রাখতে হবে।

৪। একহাত রোগীর ঘাড়ের পিছনে এবং অপর হাত রোগীর কোমরের উপরে রাখতে হবে। এক দুই তিন বলার মধ্যেই রোগীর শরীরকে খুব সাবধানে নিজের দিকে গড়িয়ে বিছানার একপাশে নিয়ে আসতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কোনো অবস্থাতেই রোগী যেনো বিছানা থেকে পড়ে না যায়।

৫। এবার হাতের পজিশন পরিবর্তন করতে হবে। একহাত রোগীর কোমরের উপরের অংশে একবার আরেকহাত রোগীর পায়ের উপরের অংশে রাখতে হবে। সুপাইন পজিশনে রেখে রোগীর সর্বোচ্চ আরাম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রোগীকে সাধারণত বিছানার একপাশ থেকে অন্য পাশে সরানো হয় কোন নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করার জন্য। যেমন, বেড মেকিং, কিংবা ড্রেস পরিবর্তন করা ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট সেবা প্রদানের কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হবে।



চিত্র ১.১২: রোগীকে বিছানায় এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরানোর উপায়

রোগীকে বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তর করা: এক্ষেত্রে প্রস্তুতি ও সমাপনি কাজের ধারা একই হওয়ায় সেগুলো পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছেনা। রোগীকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি আগে থেকেই প্রস্তুত করে নিতে হবে। যেমন: ট্রান্সফার বেল্ট, হুইলচেয়ার, রোগীর পোশাক ও জুতা প্রভৃতি।

প্রক্রিয়া:

১। হুইলচেয়ারটিকে বিছানার কাছে রোগী যে পাশে বেশি শক্তি অনুভব করেন সে পাশে রাখতে হবে। হুইলচেয়ারের পা দানিটি ভাঁজ করে রাখতে হবে এবং হুইলচেয়ারের চাকার লক অবশ্যই বন্ধ করে রাখতে হবে। অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

২। সুবিধামত বিছানার উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে হবে।

৩। বিছানার দিকে মুখ করে আনুমানিক ১২ ইঞ্চি ফাঁকা রেখে এক পায়ের সামনে আরেক পাঁয়ের পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে হবে। একহাত রোগীর পিঠে ও আরেকহাত রোগীর পায়ের উপরের অংশে শক্তভাবে রেখে এক দুই তিন বলার মধ্যেই নিজের শরীরকে বাকিয়ে রোগীকে বিছানার একপাশে সিটিং পজিশনে নিয়ে আসতে হবে।

৪। এবারে প্রয়োজন মত রোগীর জামাকাপড় পরিবর্তন অন্য কোনো কাজ করা যেতে পারে। সিটিং পজিশনে রোগীকে রেখে ২-১ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে রোগীর কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা।

৫। এরপর ট্রান্সফার বেল্টটি রোগীর কোমরে শক্ত করে আটকে দিতে হবে।

৬। রোগীকে দাড়া করানোর জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করা যায়। একটি হচ্ছে, চিত্রের ন্যায় রোগীর পিছনে হাত দিয়ে ট্রান্সফার বেল্টটি শক্ত করে আকড়ে ধরতে হবে অথবা ট্রান্সফার বেল্ট না থাকলে রোগীর দুই বাহুর নিচ দিয়ে তার দুই কাঁধে শক্ত করে ধরতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর দুই হাত কেয়ারগিভারের ঘাড়ের উপর দিয়ে দুই পাশে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য বলতে হবে। আর যদি কোনো সাহায্যকারী থাকে, তাহলেও কাজটি একইভাবে আরো সহজেই সম্পাদন করা যায়।

৭। রোগীকে শক্ত করে সাপোর্ট দিয়ে এক দুই তিন পর্যন্ত বলার সাথে সাথেই রোগীকে বসা থেকে দাড় করিয়ে ফেলতে হবে। এরপর রোগীকে ধীরে ধীরে চেয়ারের দিকে পিছনে করে নিয়ে যেতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেনো রোগীকে দুই একটির বেশি কদম ফেলতে না হয়।

৮। চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে রোগীকে ধীরে ধীরে বসার জন্য বলতে হবে। বসানোর পর রোগীর দুই হাতকে একটির পর একটি করে নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে চেয়ারের হাতলে রাখতে হবে।

৯। এরপর রোগীকে সঠিকভাবে আরামদায়ক পজিশনে বসতে সহায়তা করতে হবে। পা দানির ভাঁজ খুলে রোগীর পা দুটো এর উপর রাখতে হবে।

১০। ট্রান্সফার বেল্ট অপসারণ করতে হবে এবং হুইলচেয়ারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বেল্টের লকটি লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর প্রয়োজন হলে হুইলচেয়ারের লকটি খুলে রোগীকে নির্দিষ্ট জায়গায় অতীব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।



চিত্র ১.১৩: রোগীকে বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তরের উপায়

১.৫ ইনটেক ও আউটপুট চার্ট

কোনো রোগী গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের (মুখের) অথবা শিরাপথ (প্যারেন্টালি) -এর মাধ্যমে যেসব তরল/খাবার আকারে গ্রহণ করে (ইনটেক) এবং যা কিছু নিষ্কাশিত বা অপসারণ (আউটপুট) করে তা যে চার্টে বা টুলসে রেকর্ড করা হয় তাকে ইনটেক এবং আউটপুট চার্ট বলে। কখনও কখনও এটি ফ্লুয়েড-ব্যালেন্স চার্ট হিসাবেও পরিচিত। সাধারণত মিলিলিটার (ml) হিসেবে ইনটেক ও আউটপুট চার্টে পরিমাণ লিখা হয়।

১.৫.১ ইনটেক ও আউটপুট মনিটরিং-এর গুরুত্ব

ইনটেক ও আউটপুট মনিটরিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লিনিকাল কেয়ার প্রক্রিয়া যা রোগের-

ক) অগ্রগতি এবং উপকারের পাশাপাশি চিকিৎসার ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো নির্ধারণে সহায়তা করে।

খ)ইনটেক ও আউটপুট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কেয়ারগিভারগণ স্বাস্থ্যসেবার সাথে সাথে রোগীর তরল ও পুষ্টির সঠিক চাহিদা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

গ) আউটপুট পরিমাপ পর্যবেক্ষণ করে প্রস্রাবের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতের পাশাপাশি স্বাভাবিক মলত্যাগ করছে কিনা তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।মোট কথা ইনটেক ও আউটপুট মনিটরিং চিকিৎসা-প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

ইনটেক হিসেবে যা পরিমাপ করা হয়	**আউটপুট হিসেবে যা পরিমাপ করা হয়**
ইনটেক হিসেবে যেসব জিনিস পরিমাপ করা হয় তা হল- ক) ওরাল ইনটেক, খ) টিউব ফিডিংস, গ) ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড, ঘ) মেডিকেশন, ঙ) টোটাল প্যারেন্টেরাল নিউট্রিশন, চ) ব্লাড প্রোডাক্টস, ছ) ডায়লাইসিস ফ্লুইডস ইত্যাদি।	আউটপুট হিসেবে যেসব জিনিস পরিমাপ করা হয় তা হল- ক) ইউরিন, খ) তরল পায়খানা গ) বমি, ঘ) চেষ্ট ড্রেইনেজ ইত্যাদি।

ইউরিন পরিমাপ ও স্যাম্পল গ্রহণ

বিভিন্ন প্রকার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইউরিন খুবই উল্লেখযোগ্য একটি স্যাম্পল বা নমুনা। ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী তাই কেয়ারগিভারকে প্রায়শই ইউরিন বা প্রস্রাবের স্যাম্পল নিতে হয়। আবার নির্দেশনা অনুযায়ী পরিমাপ করতে হয় শরীর থেকে কতটুকু তরল প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে গেছে সেটিও। এক্ষেত্রে যে রোগী সজাগ, সতর্ক এবং নিজে নিজেই প্রস্রাব করতে পারেন, তিনি প্রতিবার প্রস্রাব করার সময় একটি ইউরিনাল বা বোতলে প্রস্রাব সংগ্রহ করতে পারেন। কেয়ারগিভারও এ কাজে সহযোগীতা করতে পারেন। আবার, যে সমস্ত রোগীর প্রস্রাবে সমস্যা হয়, তাদেরকে অনেক সময় ডাক্তার-নার্সরা কেথেটার পরিয়ে দেন। অনেক সময় আবার অপারেশনের আগে ব্লাডার বা মূত্রথলি খালি করতেও এটি ব্যবহৃত হয়। ইউরিনারি কেথেটার হচ্ছে রাবার বা সিলিকোনের তৈরি বিশেষ এক ধরনের নল যেটি মূত্রনালী দিয়ে প্রবেশ করানো হয় যেখান দিয়ে প্রস্রাব এসে এর সাথে সংযুক্ত একটি ব্যাগে জমা হয়। এই ব্যাগটিকে বলা হয় ইউরোব্যাগ।



চিত্র ১.১৪: ইউরোব্যাগ



চিত্র ১.১৫: ইউরিনারি ক্যাথেটার

ইউরোব্যাগে মিলিলিটার এককে দাগ কাটা থাকে যেটা দেখে ঘণ্টায় ইউরিন আউটপুট কত হলো তা দেখা যায় এবং প্রয়োজনমত ইউরিন স্যাম্পলও নেয়া যায়। সাধারণত ১০০০ মিলি. বা ১ লিটার পর্যন্ত প্রস্রাব এখানে জমা হতে পারে। তাই ইউরোব্যাগটি পূর্ণ হয়ে গেলে এটি পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দেওয়া কেয়ারগিভারের দায়িত্ব। সেই সাথে কখনো কখনো নতুন ইউরোব্যাগ সংযুক্ত করতে হয়। নিচে একটি কেথেটারাইজ্‌ড রোগীর ইউরোব্যাগ থেকে আউটপুট দেখা ও ইউরিন স্যাম্পল সংগ্রহের পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

১. প্রথমেই সঠিক উপায়ে হ্যান্ড ওয়াশ করে পিপিই পরে নিতে হবে।

২. স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কৌটা বা পাত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে নিতে হবে।

৩. রোগীকে কাছে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে অনুমতি নিতে হবে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

৪. রোগী আরামদায়ক অবস্থানে রেখে প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. কতক্ষণ আগে ইউরিন ব্যাগ সংযুক্ত করা হয়েছিলো সেটি জেনে নিতে হবে এবং সর্বেশেষ ইউরিনের পরিমাণ দেখে ইউরিন আউটপুট কত হলো তা দেখে নিতে হবে।

৬. স্যাম্পল কালেকশনের নির্দেশনা থাকলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্যাম্পল কালেকশন করে নিতে হবে। এজন্য ইউরোব্যাগের চাবি সাবধানতার সাথে খুলতে হবে যাতে করে প্রস্রাব রোগীর শরীরে বা আশেপাশে ছড়িয়ে না যায়।

৭. ইউরিন দ্বারা ইউরোব্যাগ পরিপূর্ণ হয়ে যাবার মত মনে হলে ব্যাগটি সাবধানে খুলে নিয়ে প্রস্রাবটুকু টয়লেটে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার ব্যাগ বা নতুন ইউরোব্যাগ আবার লাগিয়ে দিতে হবে।

৮. ক্যাথেটারের টিউব ধরে টানাটানি করা যাবেনা এবং রোগীর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

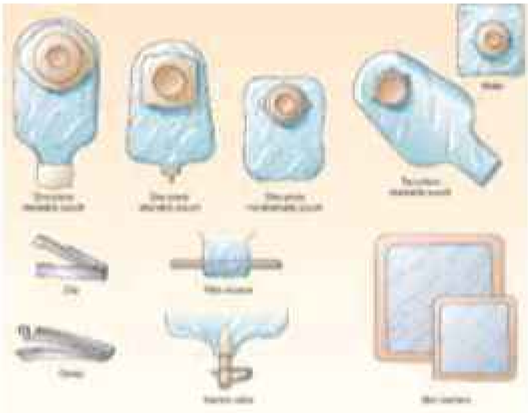
৯. সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে ইনটেক-আউটপুট চার্টে ইউরিন আউটপুটের পরিমাণ ও সময় লিখে রাখতে হবে।

১০. গৃহীত স্যাম্পল কৌটায় সঠিকভাবে ল্যাবেল করে ল্যাবে পাঠাতে হবে।

কোলোস্টোমি ব্যাগ:

কোলোস্টোমি ব্যাগ হচ্ছে প্লাষ্টিকের তৈরি বিশেষ এক ধরনের ব্যাগ যেটিকে রোগীর পেটের উপর দিয়ে অন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করে মল পদার্থ সংগ্রহ করা হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার একটি ছোট অপারেশনের মাধ্যমে এই কাজটি করে থাকেন। সাধারণত নিম্নোক্ত সমস্যা আছে এরকম রোগীদের ক্ষেত্রে কোলোস্টোমি ব্যাগ প্রয়োজন হয়।

- অন্ত্রের গুরুতর ইনফেকশন যেমন: ডাইভার্টিকুলাস
- ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিস
- কোলন বা অন্ত্রের আঘাত
- মলদ্বার বা কোলনের কোনো অংশে অবস্ট্রাকশন (বাধা) বা ইনফেকশন এবং এনাল ফিস্টুলা।



চিত্র ১.১৬: কোলোস্টোমি ব্যাগের বিভিন্ন অংশ

কোলোস্টোমি ব্যাগের যত্ন নেয়া:

১. প্রথমেই সঠিক উপায়ে হ্যান্ড ওয়াশ করে পিপিই পরে নিতে হবে।

২. স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কৌটা বা পাত্র এবং অন্যান্য উপকরন সঙ্গে নিতে হবে।

৩. রোগীর কাছে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে অনুমতি নিতে হবে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

৪. রোগীর আরামদায়ক অবস্থানে রেখে প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. কবে কোলোস্টোমি ব্যাগ সংযুক্ত করা হয়েছিলো সেটি জেনে নিতে হবে এবং সর্বশেষ পরিমাণ দেখে আউটপুট কত হলো তা দেখে নিতে হবে।

৬. স্যাম্পল কালেকশনের নির্দেশনা থাকলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্যাম্পল কালেকশন করে নিতে হবে।

৭. সাবধানতার সাথে কোলোস্টোমি ব্যাগের পাউচ সরিয়ে ব্যাগটি খুলে নিয়ে আসতে হবে। স্টোমা ও চামড়ার চারপাশ পরিষ্কার পানিতে জীবাণুমুক্ত গজের টুকরা দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৮. পুরানো ব্যাগটি সঠিক উপায়ে ডিজপোস করে নতুন ব্যাগটি সংযুক্ত করে দিতে হবে।

৯. সংযুক্ত ব্যাগ ধরে টানাটানি করা যাবেনা এবং রোগীর কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

৯. সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে ইনটেক-আউটপুট চার্টে স্টুল আউটপুটের পরিমাণ ও সময় লিখে রাখতে হবে।

১০. গৃহীত স্যাম্পল কৌটায় সঠিকভাবে ল্যাবেল করে ল্যাবে পাঠাতে হবে।

জব ১: রক্তের শর্করা পরমাপ করা

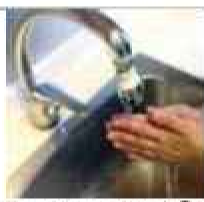
পারদর্শিতার মানদন্ড- প্রশক্ষির্নাথী এই কাজটি ভালোভাবে কয়কেবার অনুসরণ করে গ্লুকোমিটার ব্যবহাররে মাধ্যমে ব্লাড গ্লুকোজ পরমিাপ সম্পন্ন করতে পারবে।

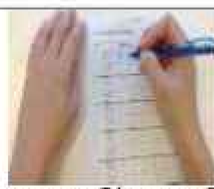
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষ সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন): ব্লাড গ্লুকোজ মিটার, টেস্ট স্ট্রিপ, ল্যান্সেট ডিভাইস ও নিডল, সার্প বক্স, ড্রাই সোয়াব (অ্যালকোহল সোয়াব), রেকর্ড চার্ট।

কাজের ধারাবাহিকতা: প্রথমে মেডিক্যাল গাইডলাইন অনুযায়ী নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে গ্লুকোমিটার ব্যাবহারের মাধ্যমে ব্লাড গ্লুকোজ পরিমাপের কাজটি সম্পন্ন করবে।

 ধাপ-১। মিটারের ডিসপ্লে প্যানেলে কোড নম্বর এর সাথে টেস্ট স্ট্রিপের বোতলের কোড নম্বর মিলিয়ে নাও।	 ধাপ-২। বাক্সে টেস্ট স্ট্রিপের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখটি পরীক্ষা করে নাও।
 ধাপ-৩। হাত ধুয়ে ভালো করে শুকিয়ে নাও।	 ধাপ-৪। ল্যানসেট ডিভাইস এবং ল্যানসেট যথাযথভাবে প্রস্তুত কর।
 ধাপ-৫। ল্যানসেট কভারটি সরিয়ে ফেল।	 ধাপ-৬। সুঁচ লোড করে ক্যাপটি খুল।

 ধাপ-৭। সাবধানতার সাথে ল্যানসেট কভারটি প্রতিস্থাপন কর।	 ধাপ-৮। ত্বকের পুরুত্ব অনুসারে সূঁচের গভীরতার সামঞ্জস্য নির্ধারণ কর।
 ধাপ-৯।লিভারটি টেনে এবং ল্যানসেট ডিভাইসটিকে প্রাইম হিসাবে ছেড়ে দাও।	 ধাপ-১০। ফয়েল থেকে পরীক্ষার স্ট্রিপটি সরিয়ে গ্লুকো মিটার পরীক্ষার স্ট্রিপ স্লটে প্রবেশ করাও।
 ধাপ-২। শুকনো সোয়াব দিয়ে আঙুলের মাথা পরিষ্কার করে নাও।	 ধাপ-১২। ল্যানসেট ডিভাইসটি আঙুলের পাশে সমতল করে এবং আলতো ভাবে প্রেস কর।
 ধাপ-১৩। ল্যানসেট ডিভাইস দিয়ে আঙুল প্রিক/ছিদ্র করে দ্রুত বের করে নাও।	 ধাপ-১৪। পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত পেতে আঙ্গুলের দিকে ম্যাসেজ কর।
 ধাপ-১৫। পরীক্ষার স্ট্রিপের ডগায় এক ফোঁটা রক্ত রাখ।	 ধাপ-১৬। আঙুলের খোঁচা সাইটের উপর শুকনো সোয়াব প্রয়োগ কর।
 ধাপ-১৭। গ্লুকোজ মিটারের রিডিং এর জন্য অপেক্ষা কর।	 ধাপ-১৮। ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত ভ্যালুটি গ্লুকোজ রেজাল্ট হিসেবে রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ কর।

 ধাপ-১৯। সঠিকভাবে এবং নিরাপদে সমস্ত ব্যবহৃত আইটেম সরিয়ে ফেলো।	 ধাপ-২০। ল্যানসেট ডিভাইস কভারটি সাবধানে সরিয়ে এবং রিক্যাপ করে একটি শক্ত ঢাকনাযুক্ত পাত্রে ফেলে দাও।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: প্রশিক্ষনার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করার পর গ্লুকোমিটার ব্যবহার করে রক্তে শর্করার পরিমাণ সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারবে।

ফলাফল বিশ্লেষণ ও মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২: ক্যাথেটার দিয়ে প্রসাবের নমুনা সংগ্রহ করার দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় ম্যাটারিয়ালস:

১। ফলিস ক্যাথেটার, ২। ইউরিন ব্যাগ, ৩। এ্যালকোহল প্যাড, ৪। ড্রাই কটন বল, ৫। ৫.০ সিসি ডিস্পজেবল সিরিঞ্জ, ৬। ২১ সাইজের নিডেল, ৭। প্লাস্টিক প্রসাবের কন্টেইনার, ৮। কালো মারকার, ৯। রোগীর রেকর্ড ফাইল, ১০। সাবান, ২। পানি, ১৩। হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ১৪। স্যাম্পল লেভেল, ১৫। টিস্যু পেপার, ১৬। বর্জ্য ধারক ইত্যাদি।



চিত্র ১.১৬: **সিরিঞ্জ ব্যবহার করে** ক্যাথেটার দিয়ে প্রসাবের নমুনা সংগ্রহের ছবি

কাজের ধারা

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পড়।

২। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ কর এবং প্রস্তুত কর।

৩। আদর্শ নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধোয়ার স্বাস্থ্যবিধি সম্পাদন কর।

৪। রোগীকে নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর এবং মৌখিক সম্মতি নাও।

৫। প্রয়োজন অনুযায়ী একটি নমুনা চাহিদা (Riquisition) প্রস্তুত কর।

৬। নমুনা সংগ্রহের জন্য রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নাও।

৭। একের পর এক ধাপ মেনে ফোলির ক্যাথেটার থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্রাব একটি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পাত্রে সংগ্রহ কর।

৮। নমুনার ধরন, রোগীর নাম, বয়স, লিঙ্গ এবং নমুনা সংগ্রহের তারিখ এবং সময় পাত্রের গায়ে লেবেল করে দিন।

৯। ব্যবহৃত হয়েছে এমন বর্জ্য নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে রাখ।

১০। নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ কর।

২। উপযুক্ত তাপমাত্রার অবস্থায় নমুনা সংরক্ষণ কর।

১২। ল্যাবে অবস্থানরত ব্যক্তির সাথে সমন্বয় কর এবং পরীক্ষাগার পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠাও।

১৩। সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ এবং কাজের এলাকাটি পরিষ্কার কর।

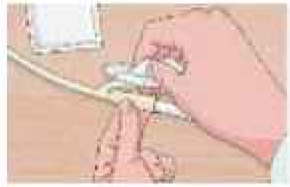
১৪। নির্দেশ অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ কর।



সিরিঞ্জে নিডেল লাগানো



ক্ল্যাম্পিং ক্যাথেটার



এ্যালকোহল প্যাড দিয়ে ক্যাথেটারের নল পরষ্কার



নিডেলের মাধ্যমে প্রসাব সংগ্রহ; কন্টেইনার এ প্রসাব সংগ্রহ

চিত্র ১.১৭: প্রসাবের নমুনা সংগ্রহের ধারাবাহিক চিত্র

কাজের সতর্কতা:

- কাজের সময় পিপিই ব্যবহার কর।
- প্রস্রাবের নমুনা সংগ্রহের জন্য সিরিঞ্জের সাথে সুই সংযুক্ত কর।
- ক্যাথেটারের সংযোগস্থলে বা ঠিক নীচে ড্রেনেজ টিউব আরটারি ফরসেফ দিয়ে ক্লাম্প করে বন্ধ কর।
- যেখান থেকে নিডেল প্রবেশ করবে সেই স্থানটি এ্যালকোহল প্যাড দিয়ে পরিষ্কার কর।
- ফোলি ক্যাথেটারটিতে ৪৫ ডিগ্রী কোণে আলতোভাবে সুই প্রবেশ করাও।
- ফোলি ক্যাথেটার থেকে সুই প্রবেশ করিয়ে প্রয়োজন পরিমাণে প্রসাব সংগ্রহ করে সুই বের কর এবং উক্ত নমুনা একটি জীবাণুমুক্ত পাত্রে ঢেলে দাও।
- ক্ল্যাম্প খুলে রোগিকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং কর। খেয়াল রাখবে কোন অপরিষ্কার উন্মুক্ত স্থানে যেন ক্যাথেটার অথবা প্রসাবের কন্টেইনারে স্পর্শ না করে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: প্রশিক্ষণার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করার পর ক্যাথেটার থেকে প্রস্রাবের নমুনা সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারবে।

ফলাফল বিশ্লেষন ও মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?

২. সুস্থ মানুষের রক্তের স্বাভাবিক গ্লুকোজের মান কত?

৩. স্যাম্পল বা নমুনা কি? উদাহরণ দাও।

৪. ল্যাবেলিং কি? কেন করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎসের উপর ভিত্তি করে ঔষধকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয় উল্লেখ কর।

২. ঔষধ সংরক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৩. ইনসুলিন কি?

৪. রোগীকে ঔষধ খাওয়ানোর সময় কি কি বিষয় খেয়াল রাখতে হয় উল্লেখ কর।

৫. ডায়াবেটিস কী? কত প্রকার ও কি কি?

৬. ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণসমূহ উল্লেখ কর।

৭. প্রেসার আলসার কি? এর পর্যায়গুলো উল্লেখ কর।

৮. পজিশনিং কি? কত প্রকার ও কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন বলতে কি বুঝায়? ঔষধের রুট কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে বর্ণনা কর।

২. ঔষধ মুখে খাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

৩. রোগীকে সঠিক অবস্থানে রাখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

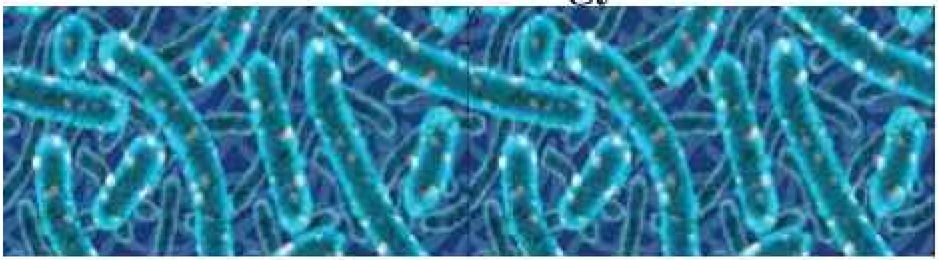
৪. রোগীর প্রেসার আলসার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কেয়ারগিভারের করণীয় উল্লেখ কর।

৫. ইনটেক ও আউটপুট কি? এটি মনিটরিং এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুজীব বিদ্যা এবং এর প্রয়োগ

Microbiology



বিজ্ঞানের যে শাখায় অণুজীব বা Microorganism সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে অণুজীব বিদ্যা বা Microbiology বলে। অণুজীবগুলো অতি ক্ষুদ্র হওয়ায়, অত্যন্ত শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এদের সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তাই অনুজীব বিদ্যার অগ্রগতি ইলেক্ট্রন- মাইক্রোস্কোপের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষের সাথে জড়িত। সেবা দানের জন্য অনুজীব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা জরুরি। অনুজীবের সংজ্ঞা, গঠন, শ্রেণিবিভাগ, বিশেষ করে 'সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির' আওতায় যে সব অনুজীবের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হয়, তাদের নাম, সৃষ্ট রোগ, জীবনচক্র, সংক্রমণ, সনাক্তকরণ পদ্ধতি ও সরঞ্জামাদি, জীবানুমুক্তকরণ পদ্ধতি, জীবাণু ধ্বংসের পদ্ধতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজের পরিধি ও পরিকল্পনা করার পূর্ব শর্ত। এ অধ্যায়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ অনুজীবের নাম, সৃষ্ট রোগ, জীবানুমুক্তকরণ, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার ও জীবাণু ধ্বংসকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- অনুজীব ও এর শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ করতে পারবো।
- অনুজীব সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রোগের নাম উল্লেখ করতে পারবো।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবো।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহারবিধি উল্লেখ করতে পারবো।
- জীবানুমুক্তকরণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবো।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবো।

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দুইটি জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে অনুজীবের গঠন, সৃষ্ট রোগ, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার, জীবানুমুক্তকরণ পদ্ধতিসমূহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির নাম উল্লেখ করা, সনাক্ত করা, কার্যাবলি উল্লেখ করা, চিকিৎসা শাস্ত্রে এর ব্যবহার, গুরুত্ব ও কাজ উল্লেখ করা এবং এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারব। জবগুলো সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

২.১ অনুজীব

অণুজীব বা Microorganism অতি ক্ষুদ্র জীবাণু (Organism) যা খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) -এর সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস, প্রটোজোয়া ইত্যাদি।

২.১.১ অনুজীবের শ্রেণিবিভাগ-

জৈবিক গঠনের উপর ভিত্তি করে ৩ টি শ্রেণিতে বিভক্ত-

১) আদিকোষী অণুজীব (Prokaryotic micro-organism), যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ব্লু-গ্রীন এলজি ইত্যাদি।

২) প্রকৃতকোষী অণুজীব (Eukaryotic micro-organism), যেমন- ছত্রাক, প্রেটোজোয়া ইত্যাদি।

৩) উপকোষী অণুজীব (Subcellular micro-organism), যেমন- ভাইরাস।

পরজীবী (Parasite): যে সকল প্রাণি অন্য প্রাণির উপর বসবাস করে, ঐ প্রাণী হতে খাদ্য গ্রহণ করে নিজে উপকৃত হয় কিন্তু আশ্রয়দাতা প্রাণির (Host) ক্ষতি সাধন করে তাকে পরজীবী (Parasite) বলে। যেমন- কৃমি, উকুন, প্লাজমোডিয়াম ইত্যাদি।

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria): ব্যাকটেরিয়া এক প্রকার এককোষী জীবাণু। এদের নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নেই- যেমন: কক্কাস, ব্যাসিলাস, স্পাইরোকিটস ইত্যাদি।

ভাইরাস (Virus): ভাইরাস এরা এক প্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু। এরা কখনও জীব আবার কখনও জড় পদার্থের মতো আচরণ করে। যেমন- এইচ.আই.ভি; হেপাটাইটিস ভাইরাস, পক্স ভাইরাস ইত্যাদি।

প্রটোজোয়া (Protozoa): প্রটোজোয়া এক প্রকার এককোষী প্রাণী। এরা একটি মাত্র কোষ দিয়েই তার জীবন চক্রের সকল কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন- এমিবা, জিয়ারডিয়া, ট্রাইকোমোনাস ইত্যাদি।

ছত্রাক (Fungus): ছত্রাক ক্লোরোফিলবিহীন এমন একটি জীবগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন পরিবেশে মৃতজীবী অথবা পরজীবী হিসেবে বসবাস করে এবং খাদ্যকে শোষণ করে দেহের অভ্যন্তরে নেয়। বর্ষাকালে স্যাঁতসেঁতে জায়গায়, বাসি পাউরুটির গায়ে, জুতার ওপর ছাতা পড়তে দেখা যায়, এরা সব ছত্রাক। খুব সহজ-সরল পরগাছা হলো ছত্রাক এবং শ্রেণিগতভাবে উদ্ভিদ। এদের পরগাছা বলার কারণ হলো যে এদের দেহে অন্য উদ্ভিদের মতো শিকড়, কান্ড ও পাতা বলতে কিছুই থাকে না, নিজেদের খাবারও নিজেরা জোগাড় করতে পারে না।

স্পোর (Spore): ব্যাকটেরিয়া যখন প্রতিকূল অবস্থায় থাকে তখন এর সাইটোপ্লাজম থেকে এক প্রকার আঠালো রস (ক্যারোটিন জাতীয় আমিষ দ্বারা গঠিত) নিঃসৃত হয়ে ব্যাকটেরিয়ার গায়ে লেগে থাকে এবং একে শৈত, তাপ ও বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাকে একে স্পোর বলে।

স্পোর (Spore) এর বৈশিষ্ট-

ক) এরা প্রতিকূল পরিবেশে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে পারে।

খ) এরা অনেক দিন না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

গ) স্পোরকে অল্প তাপ দিয়ে ধ্বংস করা যায় না।

স্পোর এর কাজ: ব্যাকটেরিয়াকে শুষ্ক তা, তাপ, ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করা, বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করা।



(ক) ব্যক্টেরিয়া (খ) ভাইরাস (গ)প্রোটজোয়া



(ঘ) স্পোর (ঙ) চত্রাক (চ) মেটাজোয়া

চিত্র ২.১: বিভিন্ন প্রকারের অনুজীব

২.২ জীবাণু সনাক্তকরণ (Identification of Organism)

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope): অণুজীবগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। সুতরাং খালি চোখে জীবাণু সনাক্তকরণ বাস্তবসম্মত নয়। অণুজীবগুলোকে সনাক্তকরণের জন্য **অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)** ব্যবহৃত হয়। রোগের কারণ নিরূপণের জন্য রোগ জীবাণু সনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোগের জীবাণু দেখে নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা করতে হলে ক্ষুদ্রাকৃতির জীবাণুগুলোকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার জন্য ৫০ থেকে ১০০গুণ বড়করে দেখা দরকার। যান্ত্রিক গঠন ও বীক্ষণ ক্ষমতার (Magnification) ভিত্তিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা: সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope), বীক্ষণ ক্ষমতা ১০ থেকে ২০ গুণ বড়; যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound microscope), বীক্ষণ ক্ষমতা ২০ থেকে ১০০ গুণ বড় ও ইলেক্ট্রোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron microscope), বীক্ষণ ক্ষমতা ২ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বড়। সকল অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই দুই ধরনের যন্ত্রাংশ রয়েছে-

ক) **যান্ত্রিক অংশ(Mechanical part):**যে সমস্ত যন্ত্রাংশ অন্যান্য যন্ত্রাংশকে উঠানামা ও নড়াচড়া করতে সাহায্যে করে সেগুলো যান্ত্রিক অংশ।

খ) **দর্শন অংশ (Optical part):** যে সমস্ত যন্ত্রাংশের সাহায্যে দর্শনীয় বস্তু বড় ও স্পষ্ট করে দেখা যায়। ব্যাপারে সহায়তা করে সেগুলো দর্শন অংশ।

ক) যান্ত্রিক অংশ (Mechanical part)

- টানা নল (Draw tube)
- দেহ নল (Body tube)
- বাহু (Limb)
- মঞ্চ ক্লিপ (Stage clip)
- মঞ্চ (Stage)
- ডায়াফ্রাম (Diaphragm)
- স্তম্ভ (Pillar).
- পাদদেশ (Microscope base)
- স্থুল সন্নিবেশক স্ক্রু (Coarse adjustment screw)
- সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু (Micrometre screw)
- বাকানো স্ক্রু (Inclination screw)

খ) দর্শন অংশ (Optical part)

- অভিনেত্র (Eye piece)
- নাসিকা স্ক্রু (Nose piece screw)
- অভিলক্ষ (Objectives)
- দর্পণ (Mirror)



চিত্র ২.২ যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র



চিত্র ২.৩ : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার

১) রোগের জীবাণু সনাক্ত করা- ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং অন্যান্য বিভিন্ন রোগের জীবাণু;

২) শরীরের বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষা- রক্ত, প্রস্রাব, পায়খানা ও অন্যান্য উপাদানসমূহ পরীক্ষা করে লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অণুচক্রিকার পরিমাণ নিরুপণ, কফ, কাশি ও পুজ পর্যবেক্ষণ

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহারবিধি-

একটি পরজীবী নিরিক্ষণের প্রক্রিয়া নিচে বর্ণনা করা হল-

১) অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহারযোগ্য কিছু কাচের স্লাইড (slide) সংগ্রহ করে সেগুলো বিশুদ্ধ পানি (Distilled water) ও রেক্টিফায়েড স্পিরিট বা ইথাইল এলকোহলের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা;

২) জীবাণুমুক্ত স্লাইডে পরজীবী আক্রান্ত রোগীর পায়খানার পাতলা প্রলেপ সৃষ্টি করা;

ক) পায়খানার নমুনার সাথে সমানুপাতিক হারে ডিস্টিল্ড পানির মিশ্রন তৈরি করা;

খ) মিশ্রণটি দিয়ে স্লাইডের উপর পাতলা প্রলেপ বা Smear তৈরি করা;

৩) নমুনাসহ স্লাইড অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মঞ্চে নির্ধারিত স্থানে মঞ্চ-ক্লিপ দিয়ে ভালোভাবে সেট করা;

৪) অণুবিক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ (Objectives) প্রথমে অল্পবীক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন অভিলক্ষ সেট করে অভিনেত্রের (Eye piece) সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বেশি বীক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা;

৫) ফোকাস ঠিক করা (Adjustment of focus)- অভিনেত্রে (Eye piece) চোখ রেখে স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু (Coarse adjustment screw) ও সুক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু (Micromere screw) ঘুড়িয়ে অভিলক্ষকে উঠা নামা করে স্লাইডে রক্ষিত নমুনা যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় সে জন্য সঠিক অবস্থানে অভিলক্ষকে সেট করা;

৬) ফোকাস করা সঠিক হলে স্লাইডের মধ্যে কৃমির বাচ্চা অথবা কৃমির ডিম স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়;

৭) নমুনাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আর যা কিছু দেখা যায় তার ফলাফল একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করা;

৮) পরিশেষে পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও নমুনাসহ স্লাইডটিতে একটি কোড নং দিয়ে এমনভাবে সংরক্ষণ কর যাতে সহজেই বোঝা যায় যে স্লাইডটি কোনো রোগীর নমুনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল;

৯) নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য উপরের নিয়মে আরও কয়েকটি পর্যবেক্ষণ স্লাইড ও কাগজ তৈরির কাজ সম্পন্ন কর;

এভাবেই অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অণুজীব ও পরজীবীর উপস্থিতি নিরূপণ করা হয়।

২.৩ অণুজীবের প্রকারভেদ

২.৩.১ ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

অধিকাংশ ছোঁয়াচে রোগের কারণ ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া এক প্রকার এককোষী আণুবীক্ষণিক জীবাণু। স্বভাবতই এদের খালি চোখে দেখা যায় না। এদের কোষে নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাই নাই। তবে কোষপ্রাচীর থাকে। অনুকূল পরিবেশ পেলে এরা দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে বংশ বৃদ্ধি করে। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের সংক্রমণ রোধ ও চিকিৎসার জন্য ব্যাকটেরিয়ার জীবনচক্রের জ্ঞান প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য অপরিহার্য।

ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১) খালি চোখে দেখা যায় না।

২) কোষ প্রাচীর ফ্লাজেলা, ফিম্ব্রিয়া ও ক্যাপসুল আছে।

৩) এদের নিউক্লিয়াস আছে।

৪) এদের দেহে কোনো ক্লোরোফিল নেই।

৫) এদের নিউক্লিয়াস এর মাঝে ক্রোমোজম আছে।

৬) এদের মাইটোকন্ড্রিয়া ও এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নেই।

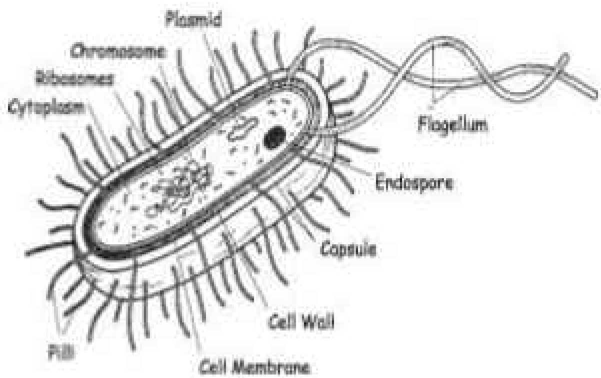
৭) এরা দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করে।

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ:

১) কক্কাস (Coccus) : গোলাকার বা চ্যাপ্টা

২) ব্যাসিলাস (Bacillus) : নলাকৃতি

৩) স্পাইরোকিট (Spirochetes) : স্প্রিং এর মত।



চিত্র ২.৪: ব্যাক্টেরিয়ার গঠন

ব্যাকটেরিয়ার জীবন প্রক্রিয়া

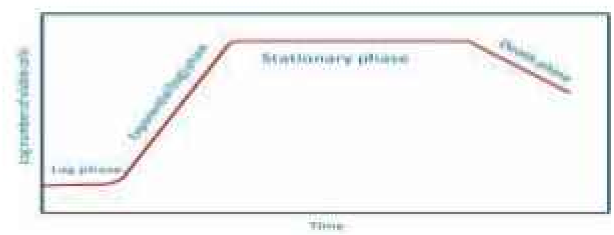
ব্যাকটেরিয়া দ্বি-মাত্রিক বৃদ্ধি (Binary fission) হারে বংশবৃদ্ধি করে। বংশবৃদ্ধির পর্যায় বা ধাপগুলো হল-

ক) খাদ্য গ্রহণ পর্যায় (Lag phase),

খ) বংশ বৃদ্ধি পর্যায় (Log phase),

গ) স্থির অবস্থা (Stationary phase),

ঘ) হ্রাস পর্যায় (Phase of decline)



চিত্র ২.৫: ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধির কার্ভ

২.৩.২ ভাইরাস (Virus)

ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জীব যাদের ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। ভাইরাস এর মাঝে ডিএনএ বা আরএনএ থাকে কিন্তু নিইক্লিয়াস থাকে না। গঠনের দিক থেকে ভাইরাস একটি পরিপুর্ণ কোষ নয় বলে একে সাবসেলুলার বা ননসেলুলার বলা হয়। ভাইরাসকে আন্তঃকোষীয় পরজীবীও (Intercellular parasite) বলা হয়। ভাইরাস কখনও জীব আবার কখনও জড়পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। মানব দেহে ভাইরাস বাহিত রোগের উদাহরণ- হেপাটাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এইডস, কোভিড-১৯ প্রভৃতি।

ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য –

১) ভাইরাস অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীবাণু।

২) ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এটা দেখা যায় না।

৩) কালচার মিডিয়াতে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।

৪) এদের বংশবৃদ্ধি হয় রেপ্লিকেশন (DNA বা RNA এর অনুলিপিকরণ)-এর মাধ্যমে।

৫) ভাইরাস এ রাইবোজম অনুপস্থিত থাকে।

ভাইরাসের আকার ও আকৃতি-

- এটি পূর্ণাঙ্গ জীবকোষ নয়।
- ভাইরাসের আকার সাধারণত ২০ থেকে ৩০০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত হয়।
- ভাইরাস বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে- লম্বাকৃতি, বুলেট আকৃতি অথবা ইট এর আকৃতির।
- ভাইরাস-এর আকৃতি ক্যাপসিড-এর উপর নির্ভির করে।

ভাইরাসের আঙ্গিক গঠনের উপাদানসমূহ-

১) নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid),
২) ক্যাপসিড (Capsid),
৩) ভাইরাস প্রোটিন (Virus protein),
৪) এনভেলপ (Envelope),
৫) রাসায়নিক মিশ্রণ (Chemical composition)

২.৩.৩ ছত্রাক (Fungi)

ছত্রাক একধরনের বহুকোষী অণুজীব যার কারণে মানুষের অনেক ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার কিছু ছত্রাক মানুষের উপকার করে থাকে। যেমন Penicillium chrysogenum নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়।

ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য -

১) সাধারণত বহুকোষী এবং সুতার মতো দেখতে হয়।
২) বেশির ভাগই মানব শরীরে রোগ সৃষ্টি করে না।
৩) এরা বাডিং বা স্পোরের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে।
৪) অধিকাংশ ছত্রাকই গ্রাম পজিটিভ
৫) এদের দেহে কোন ক্লোরোফিল নেই।

মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী গুরুত্বপুর্ণ কিছু ছত্রাক-

১) ক্যান্ডিডা (Candida),
২) এসপারজিলাস (Aspergillus),
৩) ক্রিপটোকক্কাস (Cryptococcus)
৪) ট্রিকোফাইটন (Trichophyton) ও মাইক্রোস্পোরিয়াম (Microsporium) সহ রিং ওয়ার্ম (Ring worm) সৃষ্টিকারী ছত্রাক

২.৩.৪ প্রোটোজোয়া (Protozoa)

Protista-এর বৃহৎ এক প্রাণি-দল (subkingdom), যাদের সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো মাত্র একটি কোষে দেহ গঠিত। প্রকৃত নিউক্লিয়াস, সুচিহ্নিত কোষকাঠামো এবং একটি বিপাকীয় প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট ধরন দ্বারা প্রোটোজোয়া অন্যান্য প্রটিস্টা থেকে স্বতন্ত্র, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিভাজন খুব স্পষ্ট নয়। এই এককোষী প্রাণীরা জীবনের জন্য জরুরি যাবতীয় কাজকর্ম কোষের মধ্যেই চালাতে পারে, যা অনেক উচ্চতর শ্রেণির প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্র সম্পাদন করে। প্রাণিজগতের এ উপসর্গটি নিশ্চিতই বহুজাতিক (polyphylletic)। এটি জীবরাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত এবং তা দেখিয়েছে যে প্রোটোজোয়ার কোনো কোনো পর্ব (phylum) অন্যান্য প্রোটোজোয়ার চেয়ে সুনির্দিষ্ট এককোষী উদ্ভিদের সঙ্গেই অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।



চিত্র ২.৬: প্রোটোজোয়া

প্রোটোজোয়ার বৈশিষ্ট-

১। এরা এককোষী ও কোষে কোষপ্রাচীর নাই। তবে এরা উদ্ভিদ বিভাগেরও হতে পারে যেমন ছত্রাকের কিছু প্রজাতি। প্লাজমোডিয়াম দশা।

২। এদের আকার সাধারণত ১ মাইক্রোমিটার হতে ২ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে অধিকাংশ সদস্যই অতি আনুবীক্ষনিক এবং অনুবীক্ষন যন্ত্র ছাড়া ভালো দেখা যায়না।

৩। এরা দেহের আকার পরিবর্তন করতে পারে বলে নির্দিষ্ট আকার আকৃতি থাকেনা।

৪। এরা ক্ষণপদের সাহায্যে চলাচল করে। পরজীবী প্রোটোজোয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় আন্তঃকোষীয় ফাকা স্থানে যেতে পারে। এদের কিছু সদস্যের ফ্লাজেলার মত অঙ্গ দেখা যায়।

৫। প্রতিকূল পরিবেশে এরা সিস্ট তৈরি করে এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে সিস্ট ভেঙ্গে অনেকগুলো প্রোটোজোয়া প্রাণির সৃষ্টি করতে পারে। সিস্ট হচ্ছে এদের নিষ্ক্রিয় দশা। দেহের চারপাশে একধরনের পুরু আবরণী সৃষ্টি করে তার ভেতর নিজেকে গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় রাখে এবং নিউক্লিয়াসের উপাদানগুলো সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বিপাক ক্রিয়া কমে যায়।

৬। এরা পানিতে বা ভেজা স্যাতসেতে পরিবেশে থাকে, শুষ্ক পরিবেশে সক্রিয় থাকেনা তবে সিস্ট গঠনের মাধ্যমে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে।

৬। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ করে যেমন এমিবা।

৭। এরা রোগ সৃষ্টি করতে পারে যেমন, ম্যালেরিয়া জীবানু।

২.৩.৫ মেটাজোয়া (Metazoa):

যেসব প্রাণীর দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত তাদের বহুকোষী প্রাণী বা মেটাজোয়া (Metazoa) বলে। পরিফেরা (Porifera) থেকে কর্ডাটা (Chordata) পর্ব পর্যন্ত প্রাণীদের দেহ বহুসংখ্যক কোষ দ্বারা গঠিত। যেমন: Hydra vulgaris (হাইড্রা), Copsychus saularis (দোয়েল), Homo sapiens (মানুষ), কৃমি ইত্যাদি।

কৃমি বা হেলমিন্থ

কৃমি বা হেলমিন্থ : যে সমস্ত পরজীবী খালি চোখে দেখা যায় তাদের মধ্যে কৃমি বা হেলমিন্থ অন্যতম। সকল কৃমিই মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বাস করে তবে পরিপাকতন্ত্রের সকল অঙ্গে এর অবাধ বিচরণ রয়েছে। আঙ্গিক গঠনের ভিত্তিতে কৃমিকে প্রধানত: ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

ক) নেমা কৃমি (Nema Helminth) : গোলাকার ও নলাকার কৃমি। বাংলাদেশে প্রধানত ৪ প্রকার নেমা কৃমি দেখা যায়। যেমন-

i) কেঁচো কৃমি (Round worm or Ascaris lumbricoides) রোগ - দীর্ঘ মেয়াদি বদ হজম, পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানাসহ সর্দি ও কাশি লেগা থাকা।

ii) বক্র কৃমি (Hook worm or Ankylostoma duodenale) রোগ- রক্ত শুন্যতা ও রুগ্ন স্বাস্থ্য।

iii) সুতা কৃমি (Thread worm or Enterobius vermicularis) রোগ- বদ হজম ও মলদ্বারে চুলকানি বোধ করা।

iv) ট্রাইচুরী কৃমি (Trichuris trichuria) রোগ- দীর্ঘ মেয়াদি ডায়রিয়া।

খ) প্লাটি কৃমি (Platy Helminth) : চ্যাপ্টা ও ফিতাকার কৃমি। বাংলাদেশে প্রধানত ৩ প্রকারের প্লাটি কৃমি বা ফিতা কৃমি (Tape worm or Cestodes) দেখা যায়। যেমন-

i) টেনিয়া সাজিনাটা (Beef tape worm or Taenia soginata)

ii) টেনিয়া সোলিয়াম (Pork tape worm or taenia solium)

iii) হাইমেনোলেপিস (Dwarf tape worm or Hymenolepis nana)


কেঁচো কৃমি


বক্র কৃমি


সুতা কৃমি


ট্রাইচুরী কৃমি

২.৭: বিভিন্ন ধরণের কৃমি

২.৪ জীবাণুমুক্তকরণ ও নির্জীবকরণ

জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization): জীবাণুমুক্তকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমস্ত জীবাণু স্পোরসহ ধ্বংস করা বা সরিয়ে ফেলা হয়।

নির্জীবকরণ (Disinfection): নির্জীবকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীবণুগুলোর সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হয় যাতে এরা প্রদাহ সৃষ্টি করতে না পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সব জীবাণু ধ্বংস হয়না কিছু,জীবাণু ও স্পোর বেঁচে থাকে। এ পদ্ধতিকে ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক পদ্ধতিও বলে। আবার, ব্যাকটেরিওসাইডালে জীবাণু পূর্ণাঙ্গ ধ্বংস হয়। যেমন: তাপ ও বিকিরণ পদ্ধতি।

নির্জীবকারক (Disinfectants) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্জীবকরণে ব্যবহার করা হয়।
জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি: প্রধানত দুই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করা হয়-

ক) ভৌত প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্তকরণ (Physical sterilization)

১) তাপ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Heat)
২) বিকিরণ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Radiation)
৩) ছাকন জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Filtration)

খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্তকরণ (Chemical sterilization),

তাপ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Heat)

তাপ হলো জীবাণুমুক্তকরণের সবচেয়ে দ্রুত ও কার্যকরি প্রক্রিয়া। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় কোষের প্রোটিন জমাট বেধে অণুজীব মারা যায়। অল্প তাপমাত্রায় অণুজীব বিপাকীয় কাজে স্থবিরতা আসার ফলে জীবাণু দমন করা সহজ হয়। তাপের ধরনের উপর ভিত্তি করে দুইটি পদ্ধতি বিদ্যমান-

ক) কম তাপে জীবনুমুক্তকরণ (১০০°± সেলসিয়াস তাপমাত্রার কম)

খ) উচ্চ তাপে জীবাণুমুক্তকরণ (১০০°± সেলসিয়াস তাপমাত্রার বেশি)

ক) **কম তাপে জীবাণুমুক্তকরণ**

১) **পাস্তুরীকরণ (Pasteurization):** এই পদ্ধতিতে দুধকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, নির্দিষ্ট সময় ধরে গরম করা হয় যাতে দুধে অবস্থিত সকল জীবাণু মারা গেলেও দুধের রং, গন্ধ ও পুষ্টি মান অপরিবর্তিত থাকে। পাস্তুরীকরণ প্রক্রিয়ায় যেসব জীবাণু ধ্বংস হয়- মাইকোব্যাকটেরিয়াম বোভিস (Mycobacterium bovis), ই-কোলাই (E.coli), ব্রুসেলা (Brucella) ইত্যাদি।

পাস্তুরীকরণ পদ্ধতি

I. **ফ্লাস পদ্ধতি (Flash method)**- এ পদ্ধতিতে তাপ দেওয়া হয় ৭২°± সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড ধরে।

II. **হোল্ডিং পদ্ধতি (Holding method)** এই পদ্ধতিতে তাপ দেওয়া হয় ৬৩°±- ৬৬°± সেলসিয়াস তাপমাত্র পর্যন্ত এবং ৩০ মিনিট ধরে।

২) **সেরাম ঘনকরণ (Serum Inspissation):** এই পদ্ধতি সংগঠিত হয় ৭৫°± থেকে ৮৫°± সেলসিয়াস এর মধ্যে। এই পদ্ধতিতে জমাট বাধা ছাড়াই প্রোটিণ শক্ত করে ফেলা হয়। যে সব কালচার মিডিয়াতে সিরাম থাকে তাদের এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করা হয়।

খ) **উচ্চ তাপে জীবাণুমুক্তকরণ:** ২টি প্রক্রিয়ায় করা হয়।

১) **শুষ্কতাপ (Dry heat)**

সাধারণত ১৬০°± সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, এক ঘন্টা ধরে, শুষ্ক জায়গায় তাপ দেওয়া হয় যাতে সকল জীবাণু ধবংস হয়ে যায়।

শুষ্কতাপের জীবাণুমুক্তকরণ কার্যপ্রনালী

I. প্রোটিন বিকৃতিকরণ (Protein denaturation)

II. অক্সিজেন ঘটিত ক্ষতি (Oxidative damage)

III. লবনের বিষক্রিয়া (Toxic effect of electrolyte)

কয়েকটি শুষ্কতাপের জীবাণুমুক্তকরণের উদাহরণ

i. **জলন্ত শিখা (Flaming)**

নির্ধারিত বস্তুকে আগুনের শিখার উপরে রেখে ধীরে ধীরে গরম করে গনগনে লাল রং ধারন করার মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

ii. **হট এয়ার ওভেন (Hot air oven)**

এই প্রক্রিয়ায় ১৬০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক ঘন্টা ধরে রাখা হয়। কাচের তৈরী পাত্র, কাঠি, সিরিঞ্জ; পাউডার ও তৈলাক্ত জিনিষ এর মাধ্যমে জীবাণু মুক্ত করা হয়। হট এয়ার ওভেন বিদ্যুৎ বা গ্যাস চালিত হতে পারে।

iii. **অবলোহিত বিকিরণ (Infrared irradiation)**

এ প্রক্রিয়ায় ১৮০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৭.৫ মিনিট ধরে উত্তপ্ত করা হয়। তাপরোধী বস্তু, ধাতব ও কাঁচের যন্ত্রপাতি, ধারালো বস্তু ছাড়াও ঘরের মেঝে, দেওয়াল, আসবাবপত্রের পৃষ্ঠ অবলোহিত বিকিরণের মাধ্যমে উত্তপ্ত করে জীবানুমুক্ত করা হয়।

২) **আদ্র তাপে জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization by Moist Heat)**

আদ্রতা বা বাতাসে জলীয় বাস্পের সাহায্যে তাপ সঞ্চালন করে জীবাণু ধ্বংস করা হয়।

আদ্র তাপের জীবাণুমুক্তকরণ কার্যপ্রণালী

I. জীবাণুর প্রোটিন ভেঙ্গে দেয় ও জমাট বাধায়,

II. ডিএনএ সুত্রক গুলোকে ভেঙে দেয়,

III. জীবাণুর কোষ পর্দা নষ্ট করে।

কয়েকটি আর্দ্র তাপের জীবাণুমুক্তকরণের উদাহরণ

i. **জলগাহ (Water bath):** এ প্রক্রিয়ায় ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট ধরে পানিতে সিদ্ধ করা হয়। এর মাধ্যমে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া ও তাদের স্পোর ধ্বংস হয়ে যায়।

ii. **বাষ্পীয় জীবাণুমুক্তকরণ (Steam sterilizer):** এ প্রক্রিয়ায় ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীর চাপে বাষ্প (Steam) বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়।

iii. **অটোক্লেভ (Autoclave):** এই প্রক্রিয়ায় ১২১° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, ৩০ থেকে ৬০ মিনিট ধরে, প্রতিতে ১৫ পাউন্ড/বর্গ ইঞ্চি চাপে বাষ্পের সাহায্যে তাপ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে সকল জীবাণু ও স্পোর ধ্বংস হয়ে যায়। বাষ্পের চাপ বেশি হলে নিরাপত্তা ভালোভাবে সাহায্যে অতিরিক্ত বাষ্প বের করে দেওয়া যায়। শৈল্য চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত বস্তু এর মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

বিকিরণের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করণ (Sterilization by radiation)

বিভিন্ন রশ্মির বিকিরণ জীবাণুমুক্ত করতে সক্ষম । এই রশ্মিগুলো ডিএনএ ধ্বংস করতে পারে।

উদাহরন- গামা রশ্মি (Gamma ray), আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি (Ultraviolet ray), এক্স-রে (x-ray) প্রভৃতি।

গামা রশ্মি (Gamma ray): জীবানুমুক্তকরণে ব্যবহার করা হয়।

ক) ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ খ) নিডল। গ) ট্রান্সফিউশন উপকরণ ঘ) বায়োলজিকাল দ্রব্যাদি।

আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি (Ultraviolet ray): সাধারণত ঔষধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও বিশেষ করে অপারেশন থিয়েটার জীবানুমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ছাকন (Filtration): নিচে উল্লেখিত ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্তকরণ কাজে ছাকন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন:

১। খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ কাজে।

২। দ্রবীভূত পদার্থ জীবাণু থেকে আলাদা করতে।

৩। ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়া আলাদা করতে।

৪। ভাইরাসের আকার সনাক্ত করতে।

৫। পরীক্ষার যন্ত্রপাতি বা মিডিয়া জীবাণুমুক্তকরণ কাজে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Chemical method):

১) ইথাইল এলকোহল (Ethyl alcohol): রেক্টিফাইড স্পিরীট বা ৭০% ইথাইল এলকোহল জীবাণুমুক্তকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়। ইথাইল এলকোহল জীবাণুর প্রোটিন জমাট বেঁধে দেয়, যার ফলে জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২) ফিনল এবং ডেটল (Phenol and Dettol): ফিনল এবং ডেটল জীবানু নাশক হিসাবে বহুল ব্যবহৃত যা জীবাণুর প্রোটিনকে জমাট বাধায়। বর্তমানে জীবাণুমুক্তকরণ কাজে শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ ফিনল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩) হ্যালোজেন (Halogen): ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হ্যালোজেন বলা হয়। এরা জীবাণু ধ্বংস করে। যেমন- ব্লিচিং পাউডারে ক্লোরিন থাকায় জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার হয়।

৪) ফরমালিন বা ফরমাল্ডিহাইড (Formaldehyde): ফরমালিন বা ফরমালডিহাইড স্পোরকে ধ্বংস করে থাকে। বাষ্পীয় ফরমাল্ডিহাইডের জীবাণু ধ্বংসকরার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। ঘর বিছানা এবং কাপড়জীবাণুমুক্ত করতে ফরমাল্ডিহাইডের ব্যবহার করা হয়।৪০% ফরমালিডিহাইড জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৫। ইথিলিন অক্সাইড (Ethylene oxide): এটা, গ্যাসীয় জীবাণু ধ্বংসকারক।এটা প্লাষ্টিক, রবারের জিনিস, জটিল যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

৬) ডিটার্জেন্ট (Detergent): ডিটার্জেন্ট জীবাণুর কোষ পর্দা নষ্ট করে এবং ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।

জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবহার-

২০১৫ ১) শৈল্য চিকিৎসায় জীবাণুমুক্তকরণ- অস্ত্রপচারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ।

২) অণুজীব পরীক্ষায় জীবাণুমুক্তকরণ- অণুজীব পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ।

২.৫ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বেশির ভাগ মানব কর্মকাণ্ডের মতন সেবার ক্ষেত্রেও প্রচুর বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ৭৫% বর্জ্যই পৌরসভার স্বাধারণ অন্যান্য ময়লার মত, বিপদজনক নয়। শুধুমাত্র ২৫% চিকিৎসা বর্জ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এর জন্য প্রথমে এই বিপদজনক বর্জ্য সনাক্ত করে আলাদা করে ফেলতে হবে।

বিপদজনক বর্জ্য-

বর্জ্যের উদাহরণ	ছবি	নির্ধারিত বিন
ধারালো বর্জ্য (Sharps) ব্লেড, সুঁই, কাঁচের টুকরা		
সংক্রামক বর্জ্য (Infectious) রক্ত ,কফ , পূজ ও অন্যান্য ছোঁয়াচে বস্তু রোগগত নমুনা বর্জ্য (Pathological) রক্ত , মৃত অঙ্গ ,টিস্যু ,কফ		
ক্ষতিকারক ঔষুধি বর্জ্য (Pharmaceutical) ক্যান্সারের ওষুধ ,		
রাসায়নিক বর্জ্য (Chemical)		
বিকিরণ প্রবন বর্জ্য (Radioactive) বিকিরণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও এ চিকিৎসা পরবর্তী রোগীর মল মুত্র		

বর্ণ কোড সম্বলিত চিকিৎসা বর্জ্য ধারক

Color	Category of MW	Class of MW	MOC of Pot/Container
BLACK	সাধারণ বর্জ্য GENERAL WASTE	Class – 1, 11	Non-perforated Plastic Bin
YELLOW	ক্ষতিকারক বর্জ্য HAZARDOUS WASTE	Class – 2, 3, 4, 5, & 6	Non-perforated Plastic Bin
RED	ধারালো বর্জ্য SHARP WASTE	Class – 8	Non-perforated, tightly closed Plastic Bin or Box
BLUE	তরল বর্জ্য LIQUID WASTE	Class – 10, 4	Non-perforated plastic bin or bowl
SILVER	তেজস্ক্রিয় বর্জ্য RADIOACTIVE WASTE	Class – 6	Non-perforated lead box
GREEN	পুনঃব্যবহারযোগ্য সাধারণ বর্জ্য RECYCLEABLE GENERAL WASTE	Class – 9	Non-perforated Plastic Bin

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ৩টি ধাপ: ১. সংগ্রহ ও পৃথকীকরণ (Collection & Segregation); ২. সংরক্ষণ ও পরিবহন (Storage & Transport) ও ৩. জীবানুমুক্ত ও নিষ্পত্তি করণ (Treatment & Disposal)





জব ১ জীবাণু সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে সহায়তাকরণ।

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস ও ইকুইপমেন্ট)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	অনুবীক্ষণ যন্ত্র	নমুনা মোতাবেক	১টি
৪)	মডেল স্লাইড	নমুনা মোতাবেক	১ টি

অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার উপযোগী করার কৌশলসমূহ:

১. পর্যবেক্ষণ টেবিলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করা।

২. পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।

৩. নিরক্ষণীয় স্লাইড যথাস্থানে বসিয়ে প্রস্তুত করা।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করার কৌশলসমূহ:

১. ছবিতে চিহ্নিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অংশগুলো সনাক্ত করা।

২. ছবিতে চিহ্নিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অংশগুলোর নাম পাশে লিখা।

৩. অংশগুলোর কাজ উল্লেখ করা।



অনুবীক্ষণ যন্ত্র

কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর;
- নমুনা অনুযায়ী সনাক্ত করার ড্রয়িং বুঝে নাও;
- অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার উপযোগি কর;
- সেটআপ করার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ;

- নমুনা অনুসারে মার্ক করা অংশ সনাক্ত কর;
- চিহ্নিত করার পর মার্ক করা নমুনার নাম ও এর কাজ লিখ;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার কর;
- সকল মালামাল চেক লিস্ট মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ কর;
- বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দাও।

কাজের সতর্কতা

- নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:

- নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
- **ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য:** বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২ বর্জ্য সনাক্ত ও নিষ্পত্তিকরন

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- ছবিতে প্রদর্শিত নমুনা অনুযায়ী বর্জ্যটি কোন প্রকারের তা সনাক্ত করা।
- সনাক্তকৃত বর্জ্যের জন্য নির্ধারিত ধারণ পাত্র বা বিন সনাক্ত করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস ও ইকুইপমেন্ট)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	বর্জ্য	নমুনা মোতাবেক	১টি
৪)	বিন / বর্জ্য ধারক	লাল, হলুদ, কালো, সবুজ ও রুপালি	৫ টি

বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থা করার কৌশলসমূহ:

১. নমুনা ছবি বা বর্জ্য সনাক্ত করা।

২. যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে পর্যবেক্ষণ করা।

৩. বর্জ্যের প্রকারভেদ উল্লেখ ও পৃথকিকরণ করা।

৪. নির্ধারিত বিন বা বালতি সনাক্ত করা।

৫. বর্জ্য সংরক্ষণ ও পরিবহনের মাধ্যম উল্লেখ করা।

৬. বর্জ্য নিস্পত্তিকরণের উপায়গুলো উল্লেখ করা।



চিত্র ২.৭: ইনফেকশাস মেডিকেল বর্জ্য (ব্যবহৃত মাস্ক, গ্লোভস)



চিত্র ২.৭: **ধারালো মেডিকেল বর্জ্য (সিরিঞ্জ সূচ, ভায়েল, নমুনা সংগ্রহের টিউব)**

কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর;
- নমুনা অনুযায়ী সনাক্ত করার ড্রয়িং বুঝে নাও;
- সেটআপ করার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ;
- নমুনা অনুসারে মার্ক করা অংশ সনাক্ত কর;
- চিহ্নিত করার পর মার্ক করা নমুনার নাম ও এর কাজ লিখ;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার কর;
- সকল মালামাল চেক লিস্ট মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ কর;
- বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দাও

কাজের সতর্কতা: নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. অণুজীব বলতে কি বুঝায়?
২. অণুজীবের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
৩. ব্যাক্টেরিয়া- জনিত কয়েকটি রোগের নাম লিখ।
৪. ধারালো বর্জ্য কোথায় ফেলা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. অণুজীব কি? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
২. আর্দ্র ও শুষ্ক নির্জীবকরণের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
৩. জীবানুমুক্ত করনের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ কর।
৪. অনুবীক্ষন যন্ত্রের ব্যবহারবিধি উল্লেখ কর।
৫. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

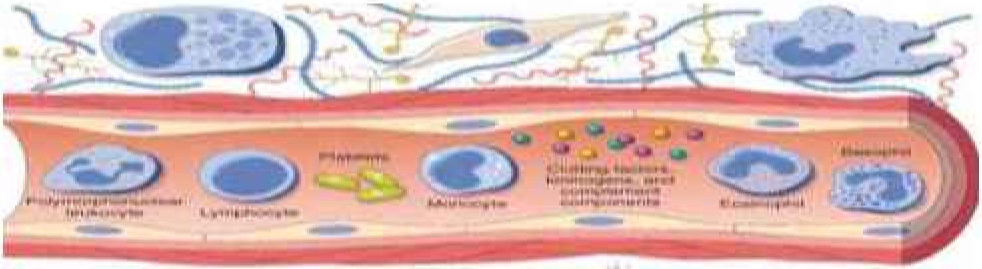
১. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ডায়াগ্রাম আঁকো।

২.জীবাণুমুক্তকরণ কেন করা হয়? যুক্তিসহ উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

সংক্রমণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

Infection, Prevention & Control



মানব শরীরের সকল রোগের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রদাহের মাধ্যমে হয়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শরীরকে বৃহত্তর ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। সেবাদানের জন্য সংক্রমণ, প্রতিরোধ, প্রদাহ ও নিরাময় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আমরা সংক্রমণ, প্রতিরোধ, প্রদাহ ও নিরাময় এবং এদের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বিভিন্ন প্রকার প্রদাহ সম্পর্কে বলতে পারব।
- নিরাময় কী তা উল্লেখ করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সংক্রমণের দ্বারা সৃষ্ট রোগের নাম উল্লেখ করতে পারব।
- সংক্রমণের দ্বারা সৃষ্ট রোগের লক্ষন বা উপসর্গ চিহ্নিত করতে পারব।
- সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে সংক্রমণের প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময় এর প্রকারভেদ, উপসর্গ ও পরিচর্যা সম্পর্কে জানতে পারব এবং এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারব। জবগুলো সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৩.১ প্রদাহ (Inflammation)

জীবিত রক্তসঞ্চালিত টিস্যুতে কোনো ক্ষতি হলে দেহ যে ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেয় তাকে প্রদাহ বলে। প্রদাহের অবস্থান যে অঙ্গে তার নামের শেষে আইটিস (Itis) কথাটি যোগ করে প্রদাহের নাম উল্লেখ করা হয়। যেমন- এপেন্ডিসাইটিস (Appendicitis), টনসিলাইটিস (Tonsilitis) ইত্যাদি। প্রদাহের ইংরেজি পরিভাষা Inflammation শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ ইনফ্লামেয়ার (Inflammare) থেকে, যার অর্থ পুড়ে যাওয়া।

প্রদাহের শ্রেণিবিন্যাস:

১। **তীব্র প্রদাহ (Acute inflammation):** আঘাত, অস্ত্রপচার অথবা সংক্রমণের ফলে ফ্লুইড, প্লাজমা প্রোটিন, লিউকোসাইট ও নিউট্রোফিল ইত্যাদির ক্ষরণ হয়। আঘাতের ফলে অতিরিক্ত প্রোটিন এবং মৃত কোষযুক্ত তরল পদার্থ ক্ষরণ হয়। যা প্রদাহের জন্য রক্তনালী থেকে বেরিয়ে টিস্যুতে জমা হয়। এই প্রদাহ কয়েক মিনিট, ঘন্টা অথবা কয়েক দিন স্থায়ী হয়।

তীব্র প্রদাহের চিহ্ন:

১) তাপ (Heat),
২) লাল হয়ে যাওয়া (Redness),
৩) ফুলে যাওয়া (Swelling),
৪) ব্যথা (Pain)
৫) কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া (Loss of function)।



চিত্র ৩.১: তীব্র প্রবাহের চিহ্ন

তীব্র প্রবাহের কারণ:

ক) সংক্রামক (Infectious agent): ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি। ব্যাকটেরিয়াই সাধারণত বেশি প্রদাহ করে থাকে।

খ) স্বতঃঅনাক্রম্য ক্ষত (Immunologic injury): রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে। যেমন- এলার্জিক রাইনাইটিস (Allergic rhinitis)

গ) ভৌত ও প্রাকৃতিক (Physical agent): বিভিন্ন ধরনের আঘাতে থেতলে যাওয়া, কেটে যাওয়া, ঠান্ডা, তাপ এবং বিকিরণের ফলে প্রদাহ সৃষ্টি হয়।

ঘ) রাসায়নিক বস্তু (Chemical agent) : শক্তিশালী অ্যাসিড, ক্ষার ও অন্যান্য অনেক রাসায়নিক পদার্থ শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে।

২। **স্থায়ীপ্রদাহ (Chronic inflammation):**

তীব্র প্রদাহ দীর্ঘ স্থায়ী হলে স্থায়ীপ্রদাহের রূপ নেয়। স্থায়ীপ্রদাহ সাধারণত তীব্র প্রদাহের অনুন্নতি থেকে সৃষ্টি হয়।

ক) সংক্রামক (Infectious agent): মাইকো ব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস (Mycobacterium tuberculosis) বা যক্ষ্মা জীবাণু, মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরি (Mycobacterium leprae) বা কুষ্ঠ জীবাণু, হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি (Helicobacter pylori) গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসার সৃষ্টিকারী জীবাণু।

খ) ভৌত ও রাসায়নিক বস্তু (Physical and chemical agent): দীর্ঘ সময় ক্ষতিকারক পদার্থের সংস্পর্শ, যেমন- ধূমপান ফুসফুসে ব্রংকাইটিস ও ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে।

গ) স্বয়ং অনাক্রম্য ব্যাধি- (Autoimmune disease):

রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস (Rheumatoid arthritis),

ক্রনস ডিজিস (Crohn's disease),

আলসারেটিভ কোলাইটিস (Ulcerative colitis) ইত্যাদি।

৩.২ নিরাময় (Healing)

কোনো ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যু আঘাত প্রাপ্তির পর যে প্রক্রিয়ায় নিজেকে পুনর্গঠন করে তাকে নিরাময় বলে। নিরাময় সাধারণত দুই ভাবে হয়,

১. পুনঃস্থাপন (Repair)

২. পুনঃউৎপত্তি (Regeneration)

নিরাময়ের জন্য উৎপাদকসমূহ:

স্থানীয় উৎপাদক	দেহতন্ত্রীয় উৎপাদক
অক্সিজেন লাভ্যতা	বয়স ও লিঙ্গ, হরমোন
সংক্রামণ	দেহের অংশবিশেষে রক্তস্বল্পতা
বহিরাগত বস্তুর অবস্থান	বহমুত্র রোগ, নির্দিষ্ট ওষুধ, অপুষ্টি

পুনঃস্থাপন (Repair):

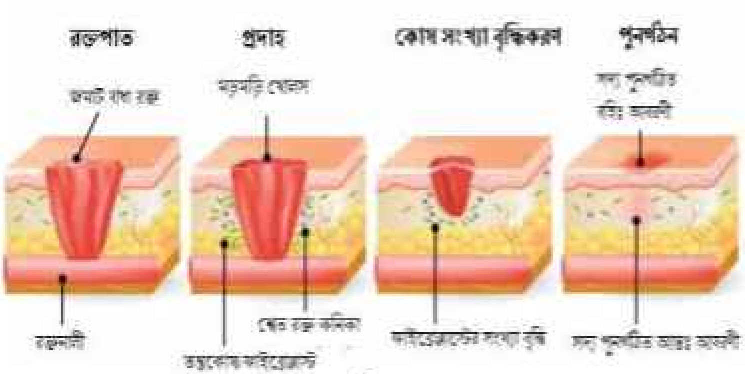
ক্ষতিগ্রস্থ কোষসমূহ নতুন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় মেরামত হওয়াকে নিরাময় বা পুনঃস্থাপন (Repair) বলে। প্রদাহের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কোষগুলও অকেজো হয়ে গেলে নতুন টিস্যুর সৃষ্টি হয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। প্রতিস্থাপিত টিস্যুই পূর্বের টিস্যুর স্থান দখল করে। এই প্রক্রিয়াকে পুনঃস্থাপন বা নিরাময় বলা হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, প্রদাহ দূরীকরণের ক্ষেত্রে ঔষধ (যেমনঃ এন্টিবায়োটিক) ছাড়াও ফিজিওথেরাপি, ইলেক্ট্রোথেরাপি, স্টেম সেল থেরাপী ও আকুপাংচার চিকিৎসাও বিশেষভাবে কার্যকর। চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরাময় বা পুনঃস্থাপন হয়:

১) রক্ত জমাট বাধন (Coagulation): এই প্রক্রিয়ায় নতুন রক্তনালী সৃষ্টি হয়,

২) প্রদাহ (Inflammation): এই প্রক্রিয়ায় ফাইব্রোব্লাস্ট ও শ্বেত রক্ত কনিকা জড়ো হয়,

৩) কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি (Proliferation): ফাইব্রোব্লাস্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করে নতুন ম্যাট্রিক্স সৃষ্টি হয়,

৪) পুনর্গঠন (Remodelling) : এই প্রক্রিয়ায় আন্তঃ ও বহিঃ আবরণী সুগঠিত হয়।



চিত্র ৩.২: পুনর্গঠন ও পুনঃউৎপত্তি

পুনঃউৎপত্তি (Regeneration)

কখনও কখনও আঘাত অথবা অস্ত্রপ্রচার জনিত কারণে দেহের অভ্যন্তরে অথবা উপরিভাগে কিছু স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে টিস্যুর পুনঃউৎপত্তির মাধ্যমে উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান পুনরায় সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে পুনঃউৎপত্তি বা রিজেনারশন বলে। একই ধরনের নতুন কলা বা কোষ দিয়ে সাধারণত ক্ষতিগ্রস্থ কলার পুণঃস্থাপন হয়ে থাকে। কলা বা কোষের পুণঃস্থাপন কোষভেদে তিন প্রক্রিয়ায় হয়। যথা:

১. লেবারেল,

২. স্টেবল ও

৩. পারমানেন্ট।

লেবারেল ও স্টেবল কোষগুলো পুণরায় তৈরি হতে পারে ও পুণঃস্থাপন হতে সক্ষম।

পুনঃস্থাপন ও পুনঃউৎপত্তির মধ্যে সাম্যক পার্থক্যঃ

পুনঃস্থাপন	পুনঃউৎপত্তি
ক্ষত চিহ্ন থাকে	ক্ষত চিহ্ন থাকে না
পুর্বের কার্য সম্পাদনায় ব্যর্থ	কার্যকর টিস্যু
অগোছালো ম্যাট্রিক্স	সুসজ্জিত স্বাভাবিক টিস্যু
ক্ষতস্থান সঙ্কুচিত হয়	সঙ্কুচিত হয় না
ত্বকের স্বাভাবিক ক্ষত নিরাময় করে	যকৃতের ক্ষত নিরাময় করে

৩.৩ সংক্রমণ (Infection)

সংক্রমণের ফলে কোনো পোষক জীবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী সংঘটকের প্রবেশ, আক্রমণ, সংখ্যাবৃদ্ধি, পোষক দেহকলার সাথে সংঘটিত বিক্রিয়া এবং এর ফলে উৎপন্ন উপসর্গের সমষ্টিকে বোঝায়। সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট রোগকে সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ বলে।

শ্রেণিবিভাগ: *উপসর্গের ভিত্তিতে সংক্রমণ দুই প্রকার।*

১) অনির্ণীত সংক্রমণ (Sub clinical infection) যা অসম্পূর্ণ রোগ লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পায়।

২) নির্ণীত সংক্রমণ (Clinical infection) যা পূর্ণ রোগ লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পায়।

জীবাণুর ভিত্তিতে সংক্রমণ

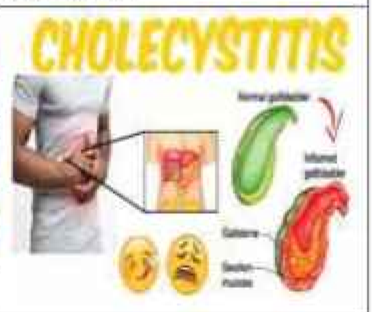
১) ব্যাক্টেরিয়া জনিত

২) ভাইরাস জনিত

৩) ছত্রাক জনিত

৪) প্লাজমোডিয়াম জনিত

সংক্রমিত অঙ্গের ভিত্তিতে রোগের সচিত্র উধাহরণ:

		
টনসিলাইটিস: গলার লসিকা গ্রন্থি বা Tonsil এর সংক্রমণ	মেনিঞ্জাইটিস মস্তিস্কের আবরণী (Meninges) এর সংক্রমণ	অটাইটিস মিডিয়া: কানের মধ্য কোঠর (Middle ear) এর সংক্রমণ
		
নিউমোনিয়াঃ ফুসফুসের (Lungs) সংক্রমণ	হেপাটাইটিস: যকৃতের (Liver) সংক্রমণ	কোলেসিস্টাইটিস: পিত্ত থলির (Gallbladder) সংক্রমণ

সংক্রমণ সংঘটক (Agent) যেমন- ভাইরাস, ভিরয়েড , প্রিয়ন, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোড (বিভিন্ন প্রকার কৃমি), পিঁপড়া, আর্থ্রোপড যেমন উকুন, মাছি এবং বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক দ্বারা সংঘটিত হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

১. সংক্রমণের উপসর্গ রোগের ধরনের উপর নির্ভর করে।

২. সংক্রমণের কিছু লক্ষণ সাধারণত পুরো শরীরকে প্রভাবিত করে, যেমন ক্লান্তি, ক্ষুধা হ্রাস, ওজন হ্রাস, জ্বর, রাতে ঘাম, ঠান্ডা, ব্যথা।

৩. অন্যদের চামড়ায় দাগ, কাশি ইত্যাদি হতে পারে।

ভাইরাসঘটিত এবং ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণের পার্থক্য	
ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ	ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ
সাধারণত বহুতান্ত্রিক-শরীরের এক বা একাধিক অংশকে আক্রমণ করে। যেমন কাশি, হাঁচি, চুলকানি, ইত্যাদি।	ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণের লক্ষণগুলো হল দেহের নির্দিষ্ট জায়গা ১. লাল হয়ে যাওয়া, ২. গরম হয়ে যাওয়া, ৩. ফোলা এবং ৪. ব্যথা।
ভাইরাসগুলো শরীরের নির্দিষ্ট অংশকেও আক্রমণ করতে পারে, যেমন চোখ উঠা।	ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যথা। উদাহরণস্বরূপ, যদি শরীরের কোথাও কেটে যায় এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়, তবে সংক্রমণের জায়গায় ব্যথা হয়।
অল্প কিছু ভাইরাসজনিত সংক্রমণ বেশ পীড়াদায়ক, যেমন বিসর্প বা হার্পিস।	ব্যাকটেরিয়াঘটিত গলা ব্যথা প্রায়ই গলার এক পাশে ব্যথা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যদি কোন কাটা অংশে পুঁজ জমে, তবে তার সম্ভাব্য কারণ ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ।

সম্পূরক পরিভাষা:

- দুষিতকরণ (Contamination) কোনো সংক্রামক জীবাণুর উপস্থিতি, যথা- কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, পানি বা খাদ্য বস্তু ইত্যাদি
- দূষণ (Pollution) সংক্রামক জীবাণু বা যে কোনো ক্ষতিকর বস্তু পরিবেশে উপস্থিতিকে দূষণ বলে। যেমন- বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি।
- পরজীবী সংক্রমণ (Infestation): শরীরের ভেতরে বা বাহিরে কোন পরজীবীর উপস্থিতি, বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধিকে পরজীবী সংক্রমণ বলে। যেমন- কৃমি দ্বারা সংক্রমণ, চুলে উকুন থাকা, ম্যালেরিয়ার জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ ইত্যাদি।
- সংক্রামক রোগ (Contagious disease): সংস্পর্শজনিত কারণে জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ বা সৃষ্ট রোগকে সংক্রামক রোগ বলে। যেমনः খোচ পাচড়া (Scabies), হাম, কলেরা, বসন্ত, ফ্লু ইত্যাদি।
- গণসংক্রামক রোগ (Communicable disease): সংক্রামক জীবাণু দ্বারা সংঘটিত রোগ যা প্রত্যক্ষভাবে মানুষ থেকে মানুষে, প্রাণি থেকে প্রাণিতে বা মানুষে, পরিবেশ থেকে মানুষে বিস্তার লাভ করে তাকে গণসংক্রামক রোগ বলে।

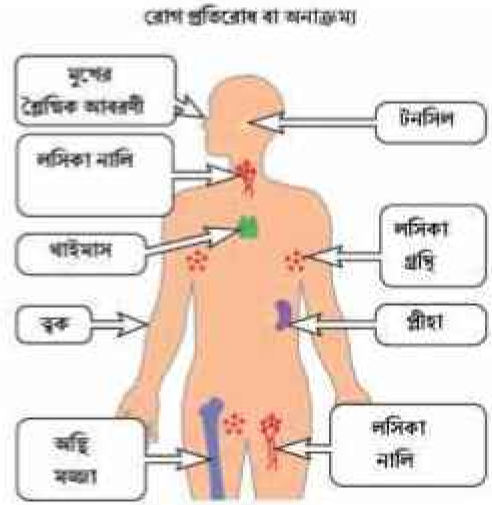
৩.৪ রোগ প্রতিরোধ (Immunity)

দেহের বাইরের বিভিন্ন ক্ষতিকারক বস্তু এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য যে বৈশিষ্ট বা ক্ষমতা বলে এসব জীবাণুকে, চিহ্নিত, আবদ্ধ ও ধ্বংস করতে পারে তাকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) বা অনাক্রম্যতা বলা হয়।

এন্টিবডি (Antibody): এন্টিবডি হচ্ছে বহিরাগত পদার্থের প্রতি সাড়া দিয়ে প্লাজমা-কোষ থেকে উৎপন্ন প্রোটিনধর্মী পদার্থ যা এর সমধর্মী এন্টিজেনের সংগে সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করে।

এন্টিজেন (Antigen): বহিরাগত বস্তুর একটি অংশ যা বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে কোষের প্লাজমা মেমব্রেনে অবস্থান নিয়ে এন্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপনা জোগায়, তাকে এন্টিজেন বলে। রোগ প্রতিরোধ বা Immunity হলো দেহের কাঠামো নিয়ে গঠিত নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা দেহে রোগব্যাধির বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে। বহিরাগত ভাইরাস বা পরজীবীর বিভিন্ন এজেন্টকে রোগ সংক্রামক জীবাণু বা Pathogen বলা হয়।

রোগ সংক্রামক জীবাণুগুলো খুব দ্রুত বৃদ্ধি বা বংশবিস্তার লাভ করে অনাক্রম্যতন্ত্রকে (Immune System) ফাঁকি দিতে পারে, আবার অনেক প্রতিরক্ষা উপাদানও একইভাবে উন্নতি করে রোগ সংক্রামক জীবাণুকে সনাক্ত ও প্রশমিত করতে পারে। অনাক্রম্যতন্ত্রের কার্যপ্রণালীর মধ্যে রয়েছে শ্বেত কনিকার ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া, ডিফেনসিন্স নামধারী ক্ষুদ্রাণুরোধী পেপটাইডসমূহ এবং কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম। মানুষের নির্দিষ্ট রোগ সংক্রামক জীবাণুগুলোর বিরুদ্ধে আরো সুচারুরূপে পদক্ষেপ নেবার মতো অধিক উন্নত প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে।



চিত্র ৩.৩: ইননেট ইমুউনিটির অঙ্গাসমূহ।

রোগ প্রতিরোধ প্রকারভেদ:

অর্জনের ভিত্তিতে:

১. ইনেট ইমুউনিটি (Innate Immunity) - যা দেহের কাঠামো, অঙ্গ, অঙ্গাণু দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং বংশগত ভাবে প্রাপ্ত

২.এ্যাকুয়ার্ড ইমুউনিটি (Acquired Immunity)– যা সংক্রমণ বা টিকা গ্রহণের পর জীবাণুর প্রতিরোধের স্মৃতি বা মেমোরি থেকে প্রাপ্ত



চিত্র ৩.৪: অনাক্রম্যতন্ত্রে কোষসমূহ

সংক্রমণের পর অনাক্রম্য স্মৃতি তৈরী করে রাখে যা একবার প্রতিরোধ করা হয়েছে এমন সংক্রামক জীবাণুর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলে।

অনাক্রম্যতন্ত্রে সমস্যার ভিত্তিতে:

১. **স্বয়ং অনাক্রম্য ব্যাধি (Auto immune Disease):** অনাক্রম্যতন্ত্র নিজ দেহ কোষকে ঠিকভাবে সনাক্ত না করে তাকে বহিরাগত কোষ মনে করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াকে স্বয়ং (অটোইম্যুনিটি) অনাক্রম্যতা বলা হয়। অনাক্রম্যতন্ত্রে কোনো সমস্যা হলে, স্থায়ী প্রদাহী ক্ষত বা ক্যান্সার হতে পারে। যেমন- হাশিমোটোস থাইরয়ডিটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস টাইপ এবং সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসাস।

২. **অনাক্রম্যহীনতা (Immune deficiency):** অনাক্রম্যতন্ত্র তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকলে এবং তা থেকে প্রাণঘাতী সংক্রমণ হতে পারে।

অনাক্রম্যহীনতার কারণ

১. জীবাণুর কারণে যেমন (এইডস/এইচ আই ভি)

২. অনাক্রম্যতন্ত্রকে দুর্বল করে এমন ওষুধ ব্যবহারের কারণেও হতে পারে। (যেমন স্টেরয়েড)

শারীরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মত জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যদি এই জীবাণুসমূহ শারীরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্বারা নিষ্ক্রিয় না হয়,তবে সহজাত অনতিক্রম্যতা এর কাজ শুরু করে, যদিওএই ধরনের প্রতিরোধ অনির্দিষ্ট ধরনের। যদি তাতেও জীবাণু নিষ্ক্রিয় না হয় তাহলে, ভিন্ন একধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা,এ্যাকুয়ার্ড ইমুউনিটি সক্রিয় হয়। এই ধরনের প্রতিরোধ জীবাণু শরীরে প্রবেশের পরই তৈরি হয় এবং ক্রমশ এর কার্যকারীতা বাড়তে থাকে এবং জীবাণু ধ্বংসের পরও এর স্মৃতি শরীরে থেকে যায় এবং পুনরায় একই জীবাণুর আক্রমণে এ্যাকুয়ার্ড ইমুউনিটি একে চিনতে পেরে সক্রিয় হয় এবং জীবানুকে প্রতিরোধ করে।

অর্জিত অনাক্রম্যতা ও ইনেট ইমিউনিটির মধ্যে পার্থক্য -

এ্যাকুয়ার্ড ইমুউনিটি (Acquired Immunity)	ইনেট ইমিউনিটি (Innate Immunity)
জীবাণু নির্দিষ্ট	জীবাণু নির্দিষ্টত নয়
জীবাণু প্রবেশের কিছুসময় পর কার্যকর হয়	তাৎক্ষনিকতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
স্মৃতিরক্ষক	স্মৃতিহীনতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
মেরুদন্ডীদের অন্যতম অন্যক্রম্যতা	সকল ধরনের প্রাণিতে উপস্থিত
সেলুলার ও হিউমোরাল অনাক্রম্যতা উপস্থিত	সেলুলার ও হিউমোরাল অনাক্রম্যতা উপস্থিত
নিজস্ব ও বাহ্যিক পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে	নিজস্ব ও বাহ্যিক পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে
মূলত এন্টিজেন এর বিপরীতে এন্টিবডির মাধ্যমে কার্যকর হয়।	বিভিন্ন যান্ত্রিক, রাসায়নিক, জৈবিক বাধা এর অন্তর্ভুক্ত।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতার অর্জনের বিভিন্ন উপায়সমূহ



ইনেট ইমিউনিটির উৎপাদকসমূহ:

ক. যান্ত্রিক বাধা দ্বারা জীবাণু বাধাগ্রস্থ হয়-

১) ত্বক,

২) ফুসফুসের হাঁচিকাশি-মিউকাস ,

৩) চোখের পানি,

৪) মুত্র,ইত্যাদি ।

খ. রাসায়নিক বাধা জীবানু ধ্বংসে অনাক্রম্য হিসেবে কাজ করে

১) ত্বক এবং শ্বসনতন্ত্রের বিটা ডিফেন্সিন এনজাইম

২) মাতৃদুগ্ধ, লালা, অশ্রুনির্গত লাইসোজাইম, ফসফোলাইপেজ এ-টু।

৩) মহিলাদের যোনিপথের অম্লধর্মী পরিবেশ এবং

৪) পুরুষের সিমেনের ডিফেন্সিন এবং জিংক

৩.৫ শারীরিক ক্ষত (Physical Wound)

কোন কারনে যদি শরীরের চামড়া বা ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ভেঙ্গে যায়, তখন তাকে ক্ষত (wound) বলে যেমন, ত্বক কেটে গেলে, স্ক্র্যাপস (Scrapes), এবং স্ক্র্যাচ (Scratch) হলে। একজন ব্যক্তি রান্না করার সময়, বাগানের পরিচর্যা করার সময় এমনকি কোনো কিছু পরিষ্কার করার সময় জখমের শিকার হতে পারে। ছোট বাচ্চারা খেলাধুলা অথবা বাড়ির মধ্যে উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেকারণেই ক্ষত তৈরি হোক না কেন, এই ক্ষতের যত্ন কিভাবে নিতে হবে তা একজন স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য জানা খুবই জরুরি। একটি যথাযথ যত্নের মাধ্যমে ক্ষত থেকে সৃষ্ট সংক্রমণ (infection) ও অন্যান্য জটিলতা (complications) থেকে রোগীকে ভালো রাখা যায়।

৩.৫.১ ক্ষত স্থানের যত্ন নেয়ার নিয়ম:

নিম্নলিখিত উপায়ে জখমে আক্রান্ত একজন রোগীর যত্ন নেয়া যেতে পারে-

১। প্রথমে সাবান- পানি দিয়ে হাত ধুয়ে এবং পরে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে নিজের হাত জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।

২। পরিষ্কার কাপড় অথবা ব্যান্ডেজ দিয়ে চেপে ধরে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।

৩। ক্ষত স্থানটিকে চলমান পানি (Running water) দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ক্ষতস্থানটির আশে-পাশে সাবান ব্যবহার করে পরিষ্কার করা যেতে পারে। তবে ক্ষতের মধ্যে যেন সাবান না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। ক্ষতটি যদি ছোট আকৃতির হয় তাহলে এ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল মলম (Antibacterial Ointment) ব্যবহার করতে হবে।

৫। ক্ষত রক্ষা করার পরবর্তী পদক্ষেপটি হল ক্ষতটিকে একটি জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং দিয়ে ঢেকে রাখা এবং একটি ব্যান্ডেজ দিয়ে সুরক্ষিত রাখা। এটি ক্ষতটির চারপাশের ত্বককে রক্ষা করে এবং ক্ষতটিকে আকারে বাড়তে বাধা দেয় এবং নিরাময়ের জন্য এটিতে চাপ প্রয়োগ করে।

৬। পরবর্তী ধাপটি হল দিনে অন্তত একবার ড্রেসিং পরিবর্তন করা। ড্রেসিং পরিবর্তন করার সময় হাত ধোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ক্ষতস্থানটি সাবধানে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ দিয়ে সুরক্ষিত করে নিতে হবে।

৭। ড্রেসিং পরিবর্তন করার সময় খেয়াল করতে হবে যে, রোগীর ক্ষতস্থানটি শুকাচ্ছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় ক্ষতস্থান থেকে হলুদ স্রাব (yellowish discharge) অথবা স্থানটি গাঢ় লাল রঙের দেখা যায়। এমনটি হওয়ার অর্থ হল ক্ষতটি ঠিকমত শুকাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে, একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৮। রুটিন অনুযায়ী ক্ষতস্থানটির বিভিন্ন লক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

জব ১: ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে প্রদাহের উপসর্গ চিহ্নিত করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- প্রদাহের উপর্সগসমূহ চহ্নিতি করা।
- প্রদাহের অবস্থান উল্লেখ করা।
- প্রদাহের সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম **(PPE):** প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি **(Tools & Equipment)**

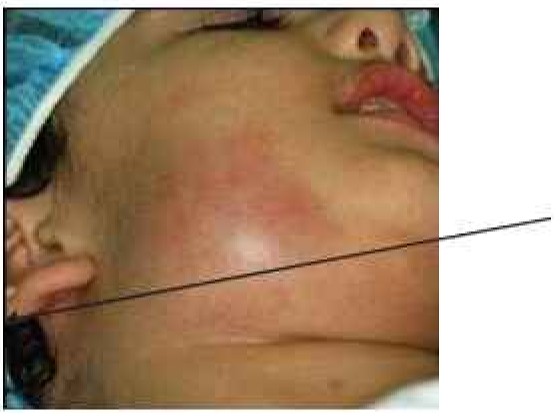
ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
৫)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
৬)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৭)	নমুনা ছবি	নমুনা মোতাবেক	১টি
৮)	মডেল	নমুনা মোতাবেক	১ টি

প্রদাহের উপসর্গ চিহ্নিত করার কৌশলঃ

১. ছবিতে চিহ্নিত প্রদাহের উপসর্গগুলো সনাক্ত করা।

২. সনাক্তকৃত উপসর্গগুলোর নাম পাশে লিখা।

৩. প্রদাহের কারণ উল্লেখ করা।



কাজের ধারা

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই পরতে হবে।
২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।
৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে প্রস্তুত করতে হবে।
৪। দুই হাতে ক্লিন গ্লোভস পরে রোগীকে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে প্রদাহের উপসর্গ চিহ্নিত করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে তার মৌখিক সম্মতি নিতে হবে।
৫। রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নিতে হবে।
৬। রোগীর ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে একের পর এক ধাপ মেনে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।
৭। রোগীর ক্ষতস্থান ও আশেপাশের কোনো পরিবর্তন যেমন লালচে ভাব, ফোলা, তাপ, ব্যথা ইত্যাদি আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।
৮। চিকিৎসক কোনো রক্তের পরীক্ষা দিয়ে থাকলে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
১০। পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ এবং কাজের এলাকাটি পরিষ্কার করে নির্দেশনা অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতা

- নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফলঃ

- নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
- **ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য:** বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২- ফুসফুসে সংক্রমণের উপসর্গ চিহ্নিত করার দক্ষতা অর্জন।



পারদর্শীতার মানদন্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।

- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্টও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- সংক্রমণের উপর্সগসমুহ চিহ্নিত করা।
- সংক্রমণের অবস্থান উল্লেখ করা।
- সংক্রমণের সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম **(PPE):** প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools & Equipment)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	নমুনা ছবি	নমুনা মোতাবেক	১টি
৪)	মডেল	নমুনা মোতাবেক	১ টি

ফুসফুসে সংক্রমণের উপসর্গ চিহ্নিত করার কৌশলঃ

১. ছবিতে চিহ্নিত সংক্রমণের উপসর্গগুলো সনাক্ত করা।
২. সনাক্তকৃত উপসর্গগুলোর নাম পাশে লিখা।
৩. সংক্রমণের কারণ উল্লেখ করা।

কাজের ধারা

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।
২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।
৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে প্রস্তুত করতে হবে।
৪। দুই হাতে ক্লিন গ্লোভস পরে রোগীকে ফুসফুসে সংক্রমণের উপসর্গ চিহ্নিত করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে তার মৌখিক সম্মতি নিতে হবে।
৫। রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নিতে হবে।
৬। রোগীকে লম্বা শ্বাস নিয়ে কাশি দিতে বলতে হবে এবং লক্ষ্য করতে হবে কাশির সাথে ঘন শ্লেষ্মা বের হয় কিনা।
৭। রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তার বুকের ব্যথা প্রায়শই ধারালো বা ছুরিকাঘাতের মত অনুভব করে কিনা এবং কাশি বা গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার সময় বুকের ব্যথা আরও বাড়ে কিনা।
৮। রোগীর জ্বর, হৃদ-স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে।
৯। রোগীর সর্দি ও হাঁচির মত উপসর্গ আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
১০। রোগীর শ্বাস কষ্টের কারণে তার ত্বক ও ঠোঁট নীল বর্ণের হয়ে যায় কি না তা দেখতে হবে।

১১। একটি স্টেথোস্কোপ বুকের উপর রেখে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ফুসফুস থেকে কোনো কর্কশ শব্দ শোনা যায় কিনা।

১২। চিকিৎসক কোনো ল্যাবরেটরী পরীক্ষা দিয়ে থাকলে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৪। পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ এবং কাজের এলাকাটি পরিষ্কার করে নির্দেশনা অনুসারে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতা

- নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:

- নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
- **ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য:** বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৩-ক্ষতস্থান চিহ্নিত ও তাঁর পরিচর্যাকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- ক্ষতস্থান চিহ্নিত করা।
- ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করা।
- ক্ষতস্থানের অবস্থান ও গভীরতা উল্লেখ করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলি সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools & Equipment)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	নমুনা ছবি বা ক্ষত	নমুনা মোতাবেক	১টি
৪)	মডেল	নমুনা মোতাবেক	১ টি

ক্ষতস্থান চিহ্নিত ও তাঁর পরিচর্যা করার কৌশলঃ

১. ছবিতে চিহ্নিত সংক্রমণের উপসর্গগুলো সনাক্ত করা।

২. সনাক্তকৃত উপসর্গগুলোর নাম পাশে লিখা।

৩. সংক্রমণের কারণ উল্লেখ করা।



কাজের ধারা

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই পরতে হবে।

২। আদর্শ নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে প্রস্তুত করতে হবে।

৪। দুই হাতে ক্লিন গ্লোভস পরে রোগীকে ক্ষতস্থান চিহ্নিত ও তাঁর পরিচর্যাকরনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে তার মৌখিক সম্মতি নিতে হবে।

৫। রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নিতে হবে।

৬। রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ক্ষতস্থান শক্ত করে চেপে ধরতে হবে।

৭। হাত বা পা কেটে গিয়ে রক্তপাত হলে ক্ষতস্থান হৃদপিন্ডের উপরে তুলে ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে রক্তপাত কম হবে, কারণ তরল পথার্থ কখনোই উপরের দিকে প্রবাহিত হতে পারে না।

৮। ক্ষতস্থানের উপর একটি পরিষ্কার কাপড়ের প্যাড দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে।

৯। এরপরেও যদি রক্তপাত না কমে সেক্ষেত্রে রক্তচাপ বিন্দু বা প্রেসার পয়েন্ট চেপে ধরতে হবে।

১০। দিনে অন্তত একবার ড্রেসিং পরিবর্তন করতে হবে। ড্রেসিং পরিবর্তন করার পূর্বে প্রতিবার হাত ধুয়ে নিতে হবে।

১১। ক্ষতস্থানটির অবস্থা যদি বেশি খারাপ হয় তাহলে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

১২। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

কাজের সতর্কতা

- নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:

- নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
- **ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য:** বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রদাহ বলতে কি বুঝায়?

২। প্রদাহের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

৩। সংক্রমণের বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ কর।

৪। নিরাময়ের উদাহরণ দাও।

৫। সংক্রমণ কেন হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রদাহ, সংক্রমণ, নিরাময় ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়গুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

২। পুনঃস্থাপন ও পুনঃউৎপত্তির মধ্যে পার্থক্য লিখ।

৩। নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদকগুলো উল্লেখ কর।

৪। নিরাময় প্রক্রিয়ার অংকন কর।

৫। প্রদাহের যত্ন প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফুসফুসে সংক্রমণের উপসর্গ চিহ্নিত করার ধাপগুলো ক্রমানুসারে বর্ণনা কর।

২। ক্ষতস্থান চিহ্নিত ও তাঁর পরিচর্যা করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সহযোগিতা

Assist in Activities of Daily Living (ADL)



দৈনন্দিন জীবনের আর দশটি স্বাভাবিক কাজের মতই আমরা বিভিন্ন সময়ে বয়স্ক মানুষকে, কোনো কোনো সময় বাচ্চাদের অথবা আমাদের পরিবারের সদস্যদের নানারকম কাজে সহায়তা করে থাকি। যেমন, ওরাল হাইজিন, টয়লেটিং, ডায়াপার বদলানো, গ্রুমিং ও ড্রেসিং, গোসল করানো, সাধারণ গৃহস্থালীর কাজকর্মে সহায়তা এবং হালকা ব্যায়ামে সহযোগীতা ইত্যাদি। আর এভাবেই আমরা নানাবিধ সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকি অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৈনন্দিন কর্মকান্ড। এই অধ্যায়ে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান ও দক্ষতা আলোচিত হয়েছে যা কেয়ারগিভিং কর্মকান্ডে ক্যারিয়ার গড়তে তোমাদেরকে অনেক সহায়তা করবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সহযোগিতা কী তা বলতে পারব।
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) বিধি সম্পর্কে বলতেপারব।
- রোগীর ওরাল হাইজিন বজায় রাখার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- রোগীকে টয়লেটিং-এ সহযোগীতা করতে পারব।
- রোগীকে ডায়াপার বদলাতে সহযোগীতা করতে পারব।
- রোগীকে গ্রুমিং ও ড্রেসিং-এ সহযোগীতা করতে পারব।
- রোগীকে গোসল করাতে পারব।

৪.১. দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সহযোগিতা -Activities of Daily Living (ADL) কি?

Activities of Daily Living (ADL) বা দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বলতে এমন কিছু সাধারন কার্যাবলীকে বুঝানো হয় যেগুলো একজন ব্যক্তিকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে জীবন ধারনের জন্য প্রায় প্রতিদিনই করতে হয়। অর্থাৎ, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত আমরা প্রতিদিন যা কাজ করি, তাই ADL যেমন: দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া, টয়লেট করা, গোসল করা, ভাত খাওয়া প্রভৃতি নানা কাজ। বাধর্ক্য বা অন্য কোন স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে ব্যক্তি যদি প্রতিদিনের এই কাজগুলো নিজে নিজে করতে না পারেন, তখন তাকে সহযোগিতা প্রদান করতে হয়। যেমন: খাওয়ানো গোসল করানো, চলাফেরা করানো ইত্যাদি। এটা হলো একজন ব্যক্তির নিত্যদিনকার কাজকর্ম। ADL হচ্ছে একজন রোগী কতটা কার্যকরী অবস্থায় আছেন তা পরিমাপের একটা উপায়। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মগুলো একজন রোগী যখন করতে পারেন না তখন তাকে অন্যদের উপর অথবা যান্ত্রিক ডিভাইসের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। রোগী যখন তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপগুলো সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়েন তখন তার জন্য তৈরি হয় একটি অনিরাপদ পরিস্থিতি যা তাদের জীবন মানের অবস্থা আরো খারাপ করে দেয়। একজন রোগীর জীবনে দৈনন্দিন কর্মকান্ডের সক্ষমতা থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার উপরে ভিত্তি করেই উক্ত রোগীদের বিভিন্ন নার্সিং হোমে কিংবা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তাছাড়াও সেসব রোগীদের জন্য বিকল্প জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বহন করতে হয়। অনেক সময় রোগীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডের সক্ষমতা পর্যালোচনা করে তাদের চিকিৎসা কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়।

৪.২ ওরাল হাইজিন

স্বাস্থ্যসম্মত মুখগহবর তথা স্বাস্থ্যবান দাঁত হল শারীরিক এবং মানসিক সুখের এক পূর্বশর্ত। জনসমক্ষে কথা বলতে, হাসতে ব্যক্তিকে প্রতিবারই দাঁত প্রদর্শন করতে হয়। অস্বাস্থ্যকর মুখগহবরের কারণে শারীরিক অসুবিধা তো আছেই - এছাড়া মুখের বাজে গন্ধ অথবা দাঁত-মাড়ির শোচনীয় অবস্থা আমাদের আত্মবিশ্বাসকেও নড়বড়ে করে দেয়। শক্ত সুগঠিত এবং স্বাস্থ্যকর মুখ ও দাঁতের সাহায্যে আমরা সঠিকভাবে খাদ্য চিবিয়ে খেতে পারি, কথা পরিষ্কারভাবে বলতে পারি এবং অবশ্যই মনোহর হাসি হাসতে পারি। ওরাল হাইজিন বলতে মুখ-গহবরের ভেতর অবস্থিত দাঁত, মাড়ি এবং জিহ্বার সম্মিলিত সঠিক এবং বিজ্ঞান সম্মত পরিচর্যাকে বুঝায়। যেসকল রোগী তাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে মুখ-গহবরের যত্ন নিতে পারেন না তারা মুখের ভিতরে দাঁতের ক্ষয় অথবা ক্যাভিটিসসহ বিভিন্ন সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকেন।



চিত্র ৪.১: দাঁতের ক্ষয় রোগ



চিত্র ৪.২: মুখের মাড়ির সংক্রমন

মুখগহবর সঠিকভাবে পরিষ্কার না করার ফলে সৃষ্ট প্লেক একসময় মাড়িতে জিঞ্জিভাইটিস নামক রোগের সৃষ্টি করে। এতে মাড়ি লাল হয়ে ফুলে যায় এবং প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি করে।

৪.২.১ মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মান সম্পন্ন মৌখিক যত্ন যে কোনো বয়সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিশেষ মৌখিক স্বাস্থ্যবিধি ও যত্নের প্রয়োজন, যেমন - বয়ঃবৃদ্ধ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। ক্রমবর্ধমানহারে বর্তমানে পরিবারের সদস্যরা কেয়ারগিভার রাখতে আগ্রহী হচ্ছেন। তাই কেয়ারগিভারদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মদক্ষতা হলো, গ্রাহকের মৌখিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জানা। ওরাল হাইজিন সাধারণ স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার মানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেকের প্রতিদিন মুখের যত্ন নেওয়া দরকার।

একটি স্বাস্থ্যকর মুখ:

১। ভালো খাদ্যাভাস তৈরি করে: কারণ ব্যক্তি স্বাদ নিতে সক্ষম হয়। কামড়,চিবানো এবং ব্যথা বা অস্বস্তি ছাড়াই খাবার গিলে ফেলতে পারে।

২। ওরাল ইনফেকশন প্রতিরোধ করে।

৩। রোগীদের নিজের সম্পর্কে ভালো বোধ করতে সহায়তা করে।

৪। দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস প্রতিরোধ করে।

মুখ সুস্থ রাখার ফলে শরীর সুস্থ থাকে।মাইক্রো-অর্গানিজম (যেমন, ব্যাকটিরিয়া) থেকে মুখের সংক্রমণ রক্ত প্রবাহে বা শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং চলাচল করতে পারে শরীরের অন্যান্য অংশে। এই অণুজীবের কারণে অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন, হৃদরোগ, স্ট্রোক ও নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসকষ্ট জনিত ব্যাধি এবং ফুসফুসের অন্যান্য রোগ। ডায়াবেটিস থাকলে রোগির মাড়ির সংক্রমণ জনিত রোগ আরও জটিল হতে পারে।

৪.২.২ মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যের দুর্বলতা বোঝার উপায় ও করণীয়

সঠিক পরিচর্যার অভাবের লক্ষণ:

১। দাঁতের ফাঁকে খাবারের অংশ বিশেষ

২। দাঁতে গর্ত এবং মূল ক্ষয়

৩। ওজন হ্রাস

৪। দীর্ঘস্থায়ী দুর্গন্ধ

৫। লাল, ফোলা বা কোমল মাড়ি, যেখান থেকে ব্রাশ বা ফ্লসিং করার সময় রক্তক্ষরণ হয়

৬। কোনো আপাত কারণে দাঁত সংবেদনশীলতা

৭। দাঁত অবস্থানচ্যুত হওয়া বা নড়া

৮। মাড়ি এবং দাঁতের চারপাশে ফোলাভাব বা পুঁজ দেখা

৯। দাঁতের ডেন্চার (আর্টিফিসিয়াল দাঁত বা ব্রেস) ঢিলা হয়ে যাওয়া

করণীয়:

মাড়ির রোগ এবং দাঁত থেকে মুখের সংক্রমণ রোধে সহায়তা করার জন্য ক্ষয়, প্লাক ব্যাকটিরিয়া (সাদা, চটচটে পদার্থ) প্রতিদিন পরিষ্কার করা আবশ্যক। যখন প্লাকটি জমতে জমতে শক্ত হয়ে যায়, তাকে ক্যালকুলাস বা টার্টার বলা হয়। গুরুতর অবস্থা হলে রোগীকে বা রোগীর অভিভাবককে সেই বিষয়ে অবগত করে এবং ডেন্টিস্টের শরনাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত। প্রয়োজনে কেয়ারগিভার রোগীকে ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার বববস্থা করবে।

৪.২.৩ মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কেয়ারগিভারের নিয়মিত কাজ

১। ফ্লোরাইড টুথপেস্ট ব্যবহার করে দিনে দু'বার দাঁত ব্রাশ করাতে হবে।

২। প্রতিদিন ফ্লসের সাহায্যে দাঁতগুলোর মধ্যে পরিষ্কার করিয়ে দিতে হবে।

৩। প্রতিটি খাবারের পরে ভালোমত কুলকুচি করানো বা ক্লায়েন্ট করতে না পারলে দাঁতের ফাঁকের ময়লা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে।

৪। যদি ব্যক্তির মুখ ঘনঘন শুকিয়ে যায়, তবে অ্যালকোহল মুক্ত মাউথওয়াশ ব্যাবহার করা যেতে পারে। বারেবারে অল্প অল্প পানি খাওয়া, এবং ঘুমানোর সময় হিউমিডিফায়ার ব্যবহার ব্যাক্তিকে হাইড্রেটেড রাখতে সহায়তা করতে পারে।

৫। বাহিরের খাবার এবং চিনিযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাবার এবং পানীয়, যেমন-ফল, শাকসবজি, শস্য দানা ও বিশুদ্ধ পানি মুখগহ্বর এবং শরীরের জন্য ভালো।

৪.২.৪ মুখগহ্বরের যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ



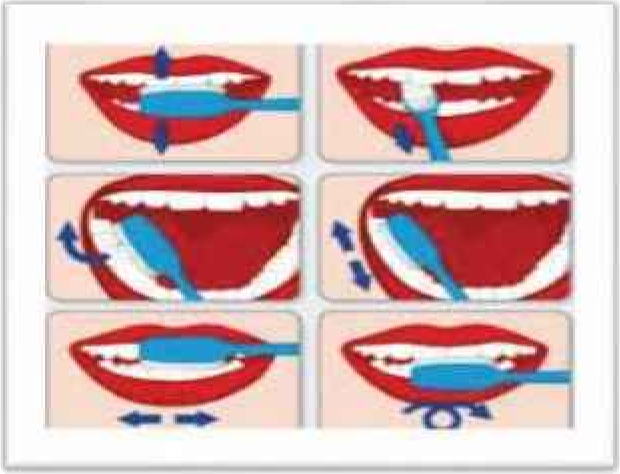
চিত্র ৪.৩: মুখগহ্বরের যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ম্যানুয়াল / ইলেক্ট্রিক টুথব্রাশ, ২। টুথপেষ্ট: ফ্লুরাইটেড টুথপেস্ট , ৩। ডেন্টাল ফ্লস, ৪। মাউথ ওয়াশ, ৫। টুথ পাউডার (প্রয়োজন হলে), ৬। পরিষ্কার পানি, ৭। টাওয়েল, ৮। টিস্যু , ৯। কুলকুচি পাত্র, ১০। আঙ্গুল টুথব্রাশ, ১২। জিহ্বা ক্লিনার ইত্যাদি।

৪.২.৫ সঠিক পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ ও জিহ্বা পরিষ্কার

ধাপ ১- দাঁত ব্রাশের মাথাটি দাঁতের বিপরিত দিকে রাখতে হবে, তারপরে মাড়ির সারির বিপরীতে ৪৫ ডিগ্রি কোণে ব্রিষ্টলের টিপসটি রেখে ছোট ছোট বৃত্তাকার গতিতে নড়াচড়া করে ব্রাশটি প্রতিটি দাঁতের সমস্ত পৃষ্ঠের উপরে কয়েকবার করে ঘুরাতে হবে।

ধাপ ২-প্রতিটি দাঁতের বাইরের পৃষ্ঠতল ব্রাশ করে উপরের এবং নীচের অংশে ব্রাশ করে মাড়ির সারির বিপরীতে রাখতে হবে।



চিত্র ৪.৪: সঠিক পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ

ধাপ ৩- সমস্ত দাঁতের অভ্যন্তরের পৃষ্ঠগুলোতে একই পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

ধাপ ৪-দাঁতের চাবানোর পৃষ্ঠগুলো ব্রাশ করতে হবে।

ধাপ ৫-সামনের দাঁতগুলোর অভ্যন্তরের উপরিভাগ পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশটি উল্লম্ব ভাবে কাত করে এবং ব্রাশের সামনের অংশটি দিয়ে কয়েকটি ছোট বৃত্তাকার গতিতে নড়াচড়া করে ঘুরাতে হবে।

ধাপ ৬- জিহ্বা ব্রাশ করার ফলে শ্বাস সতেজ হবে এবং ব্যাকটিরিয়া অপসারণে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে টুথব্রাশ বা আলাদা জিহ্বা ক্লিনার ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র ৪.৫: জিহ্বা পরিষ্কারে ক্লিনার ও টুথব্রাশের ব্যবহার

ধাপ ৭-এরপরে ভালোমত কুলকুচি করাতে হবে, তবে রোগী নিজ থেকে তা করতে না পারলে দাঁতের ফাঁকের ময়লা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে।

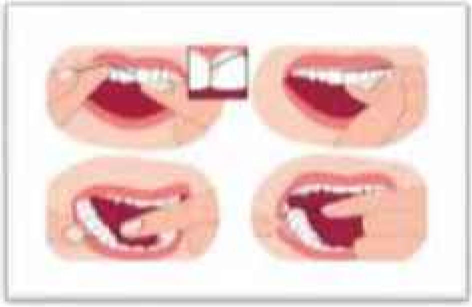
ধাপ ৮-মুখমন্ডল উষ্ণ পানি দিয়ে ভালোমত ধুয়ে বা মুছে দিতে হবে।

৪.২.৬ ডেন্টাল ফ্লসের ব্যবহার

১। ডেন্টাল ফ্লস প্রায় ১৮ থেকে ২৪ ইঞ্চি ছিড়ে নিয়ে ফ্লসটি সঠিকভাবে ধরে রাখতে হবে, বেশির ভাগ ফ্লসের অংশটি উভয় হাতের মধ্যম আঙুগলের চারদিকে পেচিয়ে রাখতে হবে। রোগীর দাঁতগুলোর জন্য প্রায় ১ থেকে ২ ইঞ্চি ফ্লস দুই আঙুলের মাঝ বরাবর রেখে দিতে হবে।

২। এর পরে, বৃদ্ধাঙুল এবং তর্জনী আঙুল দিয়ে ফ্লসটাকে ধরে রাখতে হবে।

৩। দুটি দাঁতের মাঝে ডেন্টাল ফ্লস রাখতে হবে। ধীরে ধীরে ফ্লস উপরে ও নীচে সরাতে হবে, প্রতিটি দাঁতের মধ্যে এমন করতে হবে। মাড়িতে ফ্লস লাগানো যাবে না। এটি মাড়িতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।



চিত্র ৪.৬: ডেন্টাল ফ্লস দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করার চিত্র

৪। ফ্লসটি মাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে দাঁতের গোড়ায় ফ্লসটি দিয়ে একটি সি আকার বক্ররেখা তৈরি করতে হবে। এটি ফ্লসকে মাড়ি এবং দাঁতের মধ্যস্থানে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

৫। ধাপগুলো পুনরাবৃত্তি করতে হবে। প্রতিটি দাঁতে ফ্লসটির একটি নতুন, পরিষ্কার অংশ ব্যবহার করতে হবে।

৪.৩ রোগীকে টয়লেটিং-এ সহযোগীতা করা।

স্বাস্থ্যকর্মীরা সাধারণত যেসব রোগীর যত্ন নেয় সেসব রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের টয়লেট ব্যবহারে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। সে কারণে কেয়ারগিভারগণ রোগীদের নিরাপদে টয়লেট ব্যবহারে সাহায্য করতে পারে এবং এর জন্য অনেক উপায়ই রয়েছে। এটি স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত সম্পন্ন করতে অন্য লোকেরও সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে।

৪.৩.১ টয়লেটিং এর জন্য সহযোগীতার প্রয়োজন হয় কেন?

একজন রোগীর টয়লেটিং-এর জন্য সাহায্য প্রয়োজন হয় তখন-

১। যখন প্রবীণদের পায়খানা করতে সমস্যা হয়।

২। রোগীর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে।

৩। রোগী ভীষণ অসুস্থ থাকলে।

৪। রোগীর জ্ঞান বা স্মৃতি হ্রাস পেলে।

৫। অনিয়ন্ত্রিত প্রসাব বা পায়খানা করার কারণে যদি তাদের পোশাক ও চারপাশের আসবাবপত্র ভিজে যায়।

৬। রোগীর বসা থেকে উঠতে অসুবিধা হলে।

৭। রোগীর হাঁটা, ভারসাম্য এবং চলাফেরায় অসুবিধা থাকলে।

৮।রোগীর ঘরে প্রস্রাব বা মলত্যাগের কারণে যদি গন্ধ বা দাগ পড়ে।

ইনকন্টিনেন্স: ইনকন্টিনেন্স সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে।এটি এমন একটা সমস্যা যেটি পেশী এবং স্নায়ুর সমস্যার কারণে ঘটে যা মূত্রাশয়কে প্রস্রাব ধরে রাখতে বা ছেড়ে দিতে বাধা করে। এ অবস্থায় কাশি বা হাঁচির সময় প্রস্রাব বের হতে পারে। অথবা রোগীর হঠাৎ প্রসাবের চাপ হতে পারে কিন্তু সময়মত বাথরুমে যেতে পারেন না। এটিই হল ইনকন্টিনেন্স।

৪.৩.২ সাহায্যকারী টয়লেটের প্রকারভেদ

১। টয়লেট / কমোড, ২। বেডপ্যান / ইউরিনাল, ৩। অপসারণযোগ্য টয়লেট সিট অথবা পোর্টেবল টয়লেট ও কমোড, ৪। হ্যান্ডাইল এ্যাডজাস্টেবল টয়লেট কমোড ৫। হ্যান্ড রেইল



চিত্র ৪.৭: বিভিন্ন ধরনের প্রসাব ও মলত্যাগ উপযোগী টয়লেট

৪.৩.৩ টয়লেট বা কমোড ব্যবহার করতে সাহায্য করা

একজন স্বাস্থ্যকর্মী যখন কারো যত্ন নেন, তখন রোগী যদি বিছানা থেকে উঠতে পারে তাহলে টয়লেট বা কমোড ব্যবহার করা হয়। তবে সেক্ষেত্রেও সেবাকর্মীর কাছ থেকে তার কিছু সহযোগীতার প্রয়োজন হতে পারে। পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১। রোগী কীভাবে দাঁড়াতে এবং নিরাপদে হাঁটতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।

২। যদি রোগী কমোড ব্যবহার করে, তাহলে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তিনি এটি কোথায় রাখতে চান।

৩। যদি তিনি টয়লেট বা কমোডে বসতে চান, তাহলে তাদের রেলিং এর মতো নিরাপদ কিছু ধরে বসতে বলতে হবে।

৪। তখন তাদের কাপড় সরাতে সাহায্য করতে হতে পারে।

৫। টয়লেট বা কমোড ব্যবহার করার সময় তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

৬। প্রয়োজনবোধে তাদের থেকে দূরে সরে যেতে হবে। সাহয্যকারী যদি রুম ছেড়ে যায়, তখন তাদের প্রয়োজন হলে কাছাকাছি থাকতে হবে। টয়লেটের কাজ শেষ হলে পুনরায় সেবাদানকারীর সহযোগিতা প্রয়োজন হলে তা জানাতে বলতে হবে।



চিত্র: ৪.৮: টয়লেটিং এ সহায়তা

এই সময় তাদেরকে:

১। পরিষ্কার করার জন্য টয়লেট পেপার বা ভেজা ওয়াইপস দেওয়া লাগতে পারে।
২। তাদের দাঁড়াতে সাহায্য করা লাগতে পারে।
৩। তাদের জামাকাপড় ঠিক করা বা বোতাম লাগাতে সাহায্য করা লাগতে পারে।
৪। টয়লেট পেপার বা ভেজা ওয়াইপস দিয়ে যদি নিজে পরিষ্কার হতে না পারে তাহলে পরিষ্কার কাপড় দেওয়া লাগতে পারে।
৫। তাদের হাত ধুয়ে পরিষ্কার করতে সাহায্য করা লাগতে পারে।মলদ্বার থেকে মূত্রনালীতে (শরীরের যে অংশে প্রস্রাব বের হয়) জীবাণু ছড়ানোর কারণে ইনফেকশন হতে পারে। জীবাণু ছড়ানো এবং সংক্রমণের কারণ রোধ করতে সামনে থেকে পিছনে মুছতে হবে। টয়লেটে ভেজা ওয়াইপস বা অন্যান্য পণ্য ফ্লাশ করা যাবে না। কাজ শেষ হয়ে গেলে এগুলোকে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখতে হবে অর্থাৎ এগুলো সরাসরি একটি নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে রাখতে হবে।

৪.৩.৪ টয়লেট ব্যবহারকে সহজ করা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো রোগীর টয়লেট ব্যবহারকে সহজ করতে পারে:

১। রোগীকে প্রচুর সময় দিতে হবে, যাতে সে তাড়াহুড়া না করে।
২। তাদের রুটিন মাফিক অথবা রুটিনের কাছাকাছি একটা সময়ে টয়লেটিং এর ব্যবস্থা করে দিলে।
৩। টয়লেটটি যদি অনেক দূরে হয় তাহলে মাঝ পথে একটি চেয়ার রাখতে হবে , যাতে রোগী সেখানে বিশ্রাম নিতে পারে।
৪। টয়লেটে আসা -যাওয়ার মেঝে পরিষ্কার ও পিচ্ছিলমুক্ত রাখতে হবে যাতে রোগী পা পিছলে পড়ে না যায়।
৫। রাতে নিরাপদে টয়লেটে পৌঁছাতে একটি আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
৬। যদি রোগী তাদের বাথরুমের প্রয়োজনের কথা বলতে না পারে তা হলে কোনো সংকেত লেখা অথবা ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৪.৩.৫ বেডপ্যান ও ইউরিনাল কি?

বেডপ্যান এবং ইউরিনাল হল এমন ডিভাইস যা মানুষকে মলত্যাগ করতে বা বিছানায় থাকা অবস্থায় প্রস্রাব করতে দেওয়া হয়। সাধারণত ব্যক্তি মলত্যাগের জন্য একটি বেডপ্যান ব্যবহার করেন এবং প্রস্রাব করার সময় একটি ইউরিনাল ব্যবহার করেন। মহিলারা সাধারণত মলত্যাগ এবং প্রস্রাবের জন্য বিছানার প্যান/ বেড প্যান ব্যবহার করে থাকেন।

	
চিত্র ৪.৯: বাচ্চা, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একটি সার্বজনীন পোর্টেবল ইউরিনাল	চিত্র ৪.১০: রোগীকে একটি বেডপ্যান প্লেসমেন্ট

৪.৩.৬ একজন ব্যক্তিকে বেডপ্যান ব্যবহার করতে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি

যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে:

১। বেসিনে উষ্ণ গরম পানি
২। ডিস্পজেবল গ্লাভস
৩। টয়লেট পেপার
৪। তোয়ালে
৫। পরিষ্কার কাপড় বা ভিজা ওয়াইপস

প্রস্তুতি:

১। বেডপ্যানের উপর গরম পানি ঢেলে এটি শুকিয়ে নিতে হবে। একটি ধাতব বেডপ্যান তাপ ধরে রাখে, তাই এটি ব্যক্তিকে দেওয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, এটি খুব গরম নয়।
২। বেডপ্যানের উপরের প্রান্তে বেবি পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে, যাতে ব্যক্তির নীচে সহজে স্লাইড করা যায়।

৪.৩.৭ রোগীকে ডায়াপার বদলাতে সহযোগীতা করা

ডায়াপার হচ্ছে একটি শোষণকারী উপাদান যা দু'টি পায়ের মধ্যে টেনে কোমরের চারপাশে বেঁধে দেওয়া হয়। ডায়াপার শব্দটি সাধারণত শিশুদের জন্য প্রযোজ্য যারা এখনও টয়লেট প্রশিক্ষণ পায়নি। তবে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ডায়াপার তৈরি করা হচ্ছে বেশ কিছু টয়লেটিং সমস্যা সমাধানের জন্য। যেটিকে মেডিকেলের ভাষায় ডায়াপারের পরিবর্তে এডাল্ট ন্যাপি বলা হয়। বয়স্কদের ডায়াপার বা এডাল্ট ন্যাপি সাধারণত শিশুদের সাইজের চেয়ে বড় আকারে তৈরি হয়। বয়স্কদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য ডায়াপার ব্যবহার করা হয়। যেমন: ইনকন্টিনেন্স, চলাচলে অক্ষম ব্যক্তি, ভারী ডায়েরিয়া আক্রান্ত, ডিমেনশিয়া ইত্যাদি।

৪.৩.৮ প্রাপ্ত বয়স্কদের ডায়াপারের প্রকারভেদ

সমস্যাভেদে বয়স্কদের ডায়াপারের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন:

১। লাইট ব্লাডার লিকেজ প্যাডস (Light Bladder Leakage Pads)

২। এ্যাডাল্ট ব্রিফস Adult Briefs

৩। এ্যাডাল্ট পুল-আপস/ প্রটেক্টিভ আন্ডার ওয়্যার (Adult Pull-ups/ Protective Underwear)

৪। ডিস্পোজেবল এ্যাডাল্ট ডায়াপারস (Disposable Adult Diapers)

৫। রিইউজেবল এ্যাডাল্ট ডায়াপারস (Reusable Adult Diapers)

৬। সুইম ডায়াপারস (Swim Diapers)

৭। ইনকন্টিন্যান্স ডায়াপারস ফর মেন (Incontinence Daipers for Men)

৮। ফিকাল ইনকন্টিন্যান্স ডায়াপারস (Fecal Incontinence Daipers)



ক) লাইট ব্লাডার লিকেজ প্যাডস



খ) এ্যাডাল্ট ব্রিফস



গ) এ্যাডাল্ট পুল-আপস



ঘ) ডিস্পোজেবল এ্যাডাল্ট ডায়াপারস



ঙ) রিইউজেবল এ্যাডাল্ট ডায়াপারস



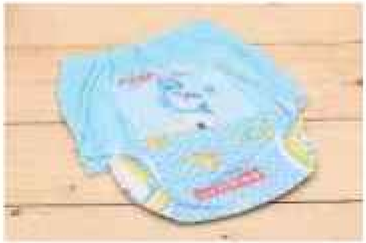
চ) ইনকন্টিন্যান্স ডায়াপারস

চিত্র ৪.১১: বিভিন্ন প্রকার এ্যাডাল্ট ডায়াপারের চিত্র

৪.৩.৯ বাচ্চাদের ডায়াপারের প্রকারভেদ

শিশুদের উপযোগী তিন প্রকারের ডায়াপার রয়েছে। পরিবেশ অনুযায়ি এই ডায়াপারগুলো নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সেগুলো হলো:

১। ডিসপোজেবল ডায়াপারস, ২। কাপড়ের ডায়াপার এবং ৩। ফ্লাশেবল ডায়াপার।


ক) ডিসপোজেবল ডায়াপার


খ) কাপড়ের ডায়াপার


গ) ফ্লাশেবল ডায়াপার।

চিত্র ৪.১২: বাচ্চাদের বিভিন্ন প্রকারের ডায়াপার

৪.৩.১০ বাচ্চাকে ডায়াপার পরানো এবং তাকে পরিচ্ছন্ন রাখা

বাচ্চাদের ডায়াপার পরানো খুবই সচরাচর আর সাধারণ একটি ব্যাপার। এটি কর্মজীবী মায়ের সময় যেমন বাচায় তেমনই বাড়িঘর বা কাপড় নোংরা করা থেকেও মুক্তি দেয়। কিন্তু প্রায়ই বাচ্চাদের যে সমস্যাটা দেখা দেয় সেটা হচ্ছে ডায়াপার র‍্যাশ। এই র‍্যাশ বাচ্চার জন্য অস্বস্তিকর ও কষ্টদায়ক। প্রথমদিকে ডায়াপার পরানো বা পরিবর্তন করা একটু কঠিন লাগতে পারে কিন্তু ধীরে ধীরে একেবারে সহজ হয়ে যায়। ডায়াপার পরাতে কিছু বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হয়। অথবা বাচ্চাদের যারা দেখা শোনা করে তাদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ভালো মানের ডায়াপার পছন্দ করা। সস্তা এবং নিম্ন মানের ডায়াপার বাচ্চার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ডায়াপার বেছে নেবার সময় তার শোষণক্ষমতা, আরামদায়ক কিনা, এবং লিকপ্রুফ কিনা তা দেখে নিতে হয়।

৪.৩.১১ ডায়াপার পরানোর সময় করণীয়

১। ডায়াপার বেশি আঁটসাঁট করে পড়ানো যাবে না, তাহলে শিশুরা খুব অস্বস্তিতে থাকবে।
২। ৬ ঘণ্টার মধ্যেই পরিবর্তন করে দিতে হবে (যদি পায়খানা করে তাহলে সাথে সাথেই পরিবর্তন করতে হবে)।
৩। বাচ্চার মল যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করতে হবে।
৪। ডায়াপার পরিবর্তন করার সময় যদি কোন র‍্যাশ দেখা যায় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে এন্টিসেপ্টিক বা ডায়াপার ক্রিম ব্যবহার করতে হবে এবং কিছু সময় ডায়াপার না পরিয়ে রাখতে হবে।

৪.৩.১২ শিশুকে পরিচ্ছন্ন করার উপায়

১। ডায়াপার বদলানোর সময় শিশুকে খুব যত্ন করে পরিষ্কার করতে হবে। এর জন্য ভেজা কাপড়, তুলার তৈরীর বল অথবা বেবি ওয়াইপস ব্যবহার করা যেতে পারে যা দিয়ে শিশুর নিম্নদেশ পরিষ্কার করা যায়।

২। শিশুকে সবসময় সামনে থেকে পেছনদিকে মোছাতে হয় (কখনই পেছন থেকে সামনের দিকে মোছানো যাবে না বিশেষ করে কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে, অন্যথায় ব্যকটেরিয়া সংক্রমন হতে পারে যা ইউরিনারি ইনফেকশন ঘটাতে পারে)

৩। শিশুর পায়ের গোড়ালি ধরে উপরে দিকটি ভালো করে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৪। তার হাটু এবং নিতম্বের ভাঁজ গুলোও পরিষ্কার করতে হবে।

৫। শিশুকে মোছানো শেষ হলে তার শরীর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শুকিয়ে ডায়াপার অয়েন্টমেন্ট অথবা ময়েশ্চারাইজিং বেবি লোশন ব্যবহার করতে হবে।

৪.৩.১৩ ডায়াপার পরানোর সময় অবশ্যই করণীয়

১। ময়লা ডায়পার শুধু দুর্গন্ধযুক্তই নয় বরঞ্চ অনেক ধরনের জীবাণুরও সংক্রমণ ঘটাতে পারে। তাই ময়লা ডায়পার নিয়মিত ফেলে দিতে হবে অন্তত দিনে একবার।

২। শক্ত ডায়াপার পরালে অনেক সময় শিশুর পায়ের ও কোমরের আশেপাশে দাগ হয়ে যেতে পারে তাই ঢিলেঢালা ডায়পার পরালে শিশুরা আরাম পায়।

৩। শিশুর ডায়াপার পরানোর জায়গায় পায়ে ও কোমরে যদি ফুসকুড়ি দেখা যায় তাহলে কিছুদিন ডায়াপার ব্যবহার করা বন্ধ রাখতে হবে।

৪। শিশুর নাভির নাড়ীটি যদি এখনও পড়ে না গিয়ে থাকে তাহলে সেই স্থানটি শুকনো রাখতে ডায়াপারের কোমরের কাছের অংশটি ভাজঁ করে নিতে হবে।



চিত্র ৪.১৩: মা তার শিশুকে ডায়াপার পরিয়ে দিচ্ছেন

৫। ছেলে শিশুকে ডায়াপার পরানোর সময় ডায়াপারটি আটকাবার আগে শিশুর লিঙ্গটি নিচের দিক করে বসাতে হবে। এটি তরলজাতীয় কিছু গড়িয়ে কোমরের উপরিভাগের দিকে আসতে বাধা দেবে।

৬। জীবাণু যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্য শিশুর ডায়পার বদলাবার পর ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।



চিত্র ৪.১৪: শিশুদের ডায়াপার বদলানোর ধারাবাহিক চিত্র

৪.৪ রোগীকে সাজসজ্জা ও পোষাক পরিধান (গ্রুমিং ও ড্রেসিং) করতে সহযোগীতা করা।

একজন অসুস্থ্য বৃদ্ধ রোগী তার দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজই নিজ থেকে করতে পারেন না যেমন, নখ কাটা, সেভ করা, জুতা পড়া, চুল আচরাণো ইত্যাদি। নিজ থেকে পোষাক পরিধান ও সঠিক ড্রেস বাছাই করতেও তারা অনেক সমস্যায় পড়ে থাকেন। তখন এসব কাজগুলো সঠিকভাবে করার জন্য নিবিড় সহযোগীতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই অধ্যায়ে আমরা এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

৪.৪.১ পোশাক নির্বাচন

১। পছন্দ সহজীকরণ করতে হবে। আলমারী অতিরিক্ত পোশাক মুক্ত রাখতে হবে কারণ অতিরিক্ত পোশাক থেকে পছন্দ করার সময় ব্যক্তি অনেকসময় উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত হতে পারে।

২। আরামদায়ক (সুতি বা লিনেন) এবং সাধারণ পোশাক বাছাই করতে হবে। পুলওভার টপসের চেয়ে সামনে থাকা বোতামসহ কার্ডিগানস, শার্ট এবং ব্লাউজ পরানো সহজ।

৩। নিশ্চিত করতে হবে, যে পোশাকগুলো ঢিলা-ঢালা ও আরামদায়ক, বিশেষত কোমর ও পশ্চাৎদেশে। কোমল এবং প্রসারিত হয় এমন কাপড়গুলো চয়ন করতে হবে।

৪। আরামদায়ক জুতা চয়ন করতে হবে । নিশ্চিত করতে হবে যে, ব্যক্তির ঐ জুতা পড়ে যেন পিছলে না যায়। বাহিরে যাওয়ার জন্য লোফার বা ভেলক্রোসহ জুতা চয়ন করা নিরাপদ।

৫। নমনীয় হয়ে বুঝতে হবে, যদি ব্যক্তি একই পোশাক বারবার পরতে চান, তবে অনুরূপ পোশাক কয়েকটি কিনে চিহ্নিত করে রাখতে হবে যেন পরিষ্কার করার সময় বিভ্রান্ত হতে না হয়।





চিত্র ৪.১৫: পোষাক নির্বাচনের একটি ছবি

৪.৪.২ পোশাক পরিধান করিয়ে দিতে করণীয়

১। প্রতিটি পোশাকের ধরন অনুযায়ী আলাদা করতে হবে। যেমন অন্তর্বাস প্রথমে, পরে প্যান্ট, পরে একটি শার্ট এবং তারপরে একটি সোয়েটার।

২।যদি সম্ভব হয়, তবে ব্যক্তিকে পছন্দসই পোশাক বা রঙ নির্বাচন করার সুযোগ দিতে হবে, তবে ব্যাপারটি সহজতর করার জন্য দুটি বিকল্প পছন্দ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৩। সরল ও সরাসরি নির্দেশনা দিতে হবে। সম্ভব হলে নিজে নিজের পোশাক পরতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একটি একটি করে পোশাক এগিয়ে দিয়ে তার নির্দেশনা স্পষ্ট করে বলতে হবে।

৪। আবহাওয়া অনুযায়ী যথাযথ পোশাক পরিধানে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে।

৫। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।

পরিধানরত পোশাক অপসারণের কৌশল

১। রোগী যদি বাহু বা কাঁধে আঘাতপ্রাপ্ত হন, তবে আঘাতহীন দিক থেকে জামা খুলতে শুরু করতে হবে।

২। জামা খুলতে, বোতম/জিপার/ভেলক্রো খুলে জামাটি পিছন দিকে নীচে থেকে উপরের দিকে নিয়ে আসতে হবে। কাঁধটি সামান্য উঁচু করে ধরে হাতা খুলে ফেলতে হবে। অপর পাশের হাতা তারপর এক টান দিয়ে খোলা যাবে।

৩। প্যান্ট খুলার জন্য, কোমরের কাছে আলগা করে বোতাম বা চেইন থাকলে খুলে ফেলতে হবে। প্যান্টটি কোমরের অংশটি ধরে নীচের দিকে টেনে খুলে দিতে হবে।

পোশাক পরানোর কৌশল

১। রোগী যদি বাহু বা কাঁধে আঘাতপ্রাপ্ত হন, তবে আঘাতপ্রাপ্ত দিক থেকে জামা পরাতে শুরু করতে হবে। সেবাদানকারীর হাতটি জামার হাতার মধ্য দিয়ে নিয়ে তার হাতটি ধরে ভেতরে ঢুকাতে সাহায্য করতে হবে।অপর হাতটি ধরে সহজেই পরিয়ে দেওয়া যাবে।

২। প্যান্ট পরানোর জন্য, সেবাদানকারীর হাতটি প্যান্টের পায়ের অংশের ভেতর দিয়ে কোমর পর্যন্ত নিয়ে রোগীর পা ধরে ভেতর দিকে নিয়ে আস্তে হবে। তার প্যান্টটি কোমর পর্যন্ত টেনে তুলে বোতাম/জিপার/ভেলক্রো/ফিতা লাগিয়ে দিতে হবে।

৪.৪.৩ প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা (গ্রুমিং)-এর প্রথমিক পরিকল্পনা

শারীরিক বা মানসিক ভাবে অসুস্থ বা বয়সজনিত কারণে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ হারানো কোনো ব্যক্তির চুল কীভাবে আঁচড়াতে হয়, নখ কাটতে হয় বা শেভ করতে হয় তা ভুলে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে কিছু প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। যেমন:

১। সাজসজ্জার রুটিনগুলো গ্রাহকের পরিবারের সাথে কথা বলে বা সম্ভব হলে গ্রাহকের সাথে কথা বলে জেনে নিতে হবে।

২। পরিবারের সাথে কথা বলে বা সম্ভব হলে গ্রাহকের সাথে কথা বলে তার প্রিয় প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যাপারেও জেনে নিতে হবে এবং সেগুলোই ব্যবহার করতে হবে।

৩। ব্যক্তির পাশাপাশি সেবাদানকারী তার নিজের সাজসজ্জার কাজগুলো সম্পাদন করে নিতে পারে। যেমন- নিজের চুল আঁচড়ানো।

৪। বিপদমুক্ত ও সহজতর সাজসজ্জার সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। যেমন- বৈদ্যুতিক শেভার, রেজারের চেয়ে কম ঝুঁকিযুক্ত হতে পারে।

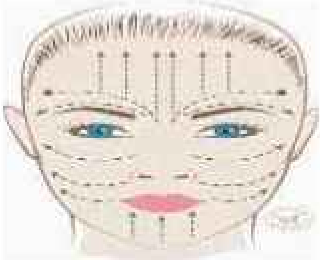
৪.৪.৪ মুখমণ্ডলের যত্ন

মুখমণ্ডল ধৌতকরণ

১। একটি অ্যালকোহলমুক্ত মৃদু ক্লিনজার/ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে হবে।

২। মুখমণ্ডল হালকা গরম পানিতে ভিজিয়ে ক্লিনজার/ফেসওয়াশ প্রয়োগ করতে আঙ্গুল ব্যবহার করতে হবে।

৩। ক্লিনজার/ফেসওয়াশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অবলম্বন করতে হবে:



চিত্র ৪.১৬: ক্লিনজার/ফেসওয়াশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুখমন্ডল ম্যাসাজের দিক নির্দেশনা

ক। ত্বক স্ক্রাব করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ স্ক্রাবিং ত্বককে অতিরিক্ত শুষ্ক করে।

খ। হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে স্পঞ্জ করে মুছে একটি নরম তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে শুকনো করে মুছে ফেলতে হবে।

গ। ত্বক শুষ্ক বা ত্বকে চুলকানি হলে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে দিতে হবে।

ঘ।দিনে দুইবার (সকালে একবার এবং রাতে একবার) এবং অতিরিক্ত ঘামের পরে মুখমন্ডল ধৌতকরণ সীমাবদ্ধ করতে হবে। বিশেষত যখন টুপি বা হেলমেট পরার ফলে ত্বক জ্বালা করে। অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্বক ধুয়ে দিতে হবে।

৪.৪.৫ পুরুষদের ক্ষেত্রে মুখমন্ডলে শেভিং

প্রস্তুতি:

১। রোগী বাসায় শেভিং করতে ইচ্ছুক না হলে, সেলুনে করতে ইচ্ছুক কিনা তা জেনে নিতে হবে।

২। প্রথমে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে আলো আছে যাতে দু'জনকেই ভালোভাবে দেখতে পারা যায়। ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুসারে চেয়ারে বসতে বা বিছানায় বসতে সাহায্য করত হবে। তবে রোগী যদি শয্যাশায়ী হন, তবে শুয়ে থাকা অবস্থায় শেভিং করতে হবে।

৩। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে। যেমন- একটি আয়না, একটি রেজার বা বৈদ্যুতিক শেভার, শেভিং ক্রিম, একটি পরিষ্কার তোয়ালে এবং গরম পানির একটি পাত্র।

শেভিং প্রক্রিয়া:

১। শুরু করার আগে, ব্যক্তির চিবুকের নীচে একটি তোয়ালে রেখে পানির ফোঁটাগুলো আটকাতে হবে। দাঁড়ি নরম করতে হালকা গরম পানিতে তোয়ালে বা স্পঞ্জ ভিজিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে।

২। শেভিং ক্রিম প্রয়োগ করতে হবে।

৩। একটি ভালো রেজার ব্যবহার করতে হবে, যেন রেজার দ্বারা কেটে যাওয়ার গুরুতর ঝুঁকি এড়ানো যায়।

৪। দাঁড়ির বৃদ্ধি যেদিকে সেদিক বরাবর শেভ করতে হবে।

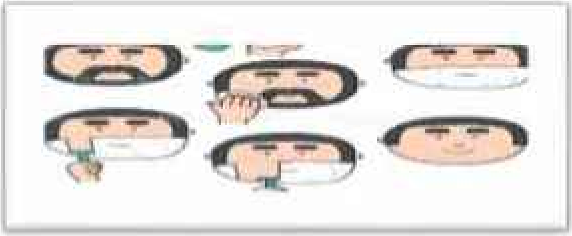
৫। প্রবীণদের ত্বক পাতলা এবং খুব সংবেদনশীল। তাই সংক্ষিপ্ত এবং ধীর গতির স্ট্রোক ব্যবহার করতে হবে। সর্বদা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, "আপনার কেমন লাগছে?" বা "আপনার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?" ।

৬। অ্যাডামস্ আপেল, মুখ, নাক এবং চিবুকের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

৭। ২-৩ টি স্ট্রোকের পরে প্রতিবার রেজারের ফলকটি ধুয়ে ফেলতে হবে।

৮। অবশিষ্ট শেভিং ক্রিম সরানোর জন্য একটি উষ্ণ ভেজা কাপড় ব্যবহার করতে হবে। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ত্বক শুকিয়ে নিতে হবে।

৯। যদি তিনি আফটার শেভ লোশন ব্যবহারে অভ্যস্ত হন, তবে প্রাকৃতিক আফটার শেভ লোশন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।



চিত্র ৪.১৭: একটি শেভিং পদ্ধতি

৪.৪.৬ চুলের যত্ন

১। রোগী চুল বাসায় কাটাতে ইচ্ছুক না সেলুনে, তা জেনে নিতে হবে। বাসায় কাটাতে ইচ্ছুক হলে চুল কাটে এমন ব্যক্তিকে বাসায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। চুল ছোট এবং একটি সহজ স্টাইলে রাখতে হবে। গ্রাহকের ব্যক্তিগত পছন্দের সম্মান দিতে হবে।

৩। বাথটাব বা ঝরণায় খুব অসুবিধা হলে, রান্নাঘরের সিঙ্কে বা বাথরুমের বেসিনে চুল ধুয়ে দিতে হবে।

৪। চুল ধোয়া অসম্ভব হলে ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়, এমন একটি শুকনো শ্যাম্পু ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫। যদি ব্যক্তি শয্যাশায়ী হন, তবে চুল অবশ্যই বিছানায় ধুতে হবে। একটি বড় প্লাস্টিকের শিট বালিশের উপর রেখে ব্যক্তিকে শুইয়ে ব্যক্তির ঘাড়ের নিচে একটি তোয়ালে ভাঁজ করে স্থাপন করতে হবে। প্লাস্টিকের শিটের অপর প্রান্ত একটি বালতিতে রাখতে হবে।

৬। ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিরুনি ব্যবহার করতে হবে। চিরুনি নিয়মিত ছোট ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।ধারালো দাঁতযুক্ত চিরুনি স্কাল্পে আঘাত করতে পারে। একটি হালকা স্পর্শের চিরুনি ব্যবহার করে ব্যক্তিকে নিজেরচুল নিজে আঁচড়াতে উৎসাহিত করতে হবে।

৪.৪.৭ চোখের যত্ন

১। পরিষ্কার হালকা গরম পানিতে পাতলা ছোট রুমাল ভিজিয়ে চোখের পরিধি (চোখের চারপাশের বৃত্তাকার অঞ্চল) ভালোভাবে মুছে দিতে হবে।

২। জ্বালাপোড়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে সাবান ব্যবহার না করাই ভালো। চোখের ভিতরের কোণা থেকে বাইরের কোণার দিকে হাতের রুমালটি পরিচালিত করতে হবে।

৩। পরিষ্কার করার সময় প্রতিটি চোখের ক্ষেত্রে রুমালের ভিন্ন অংশ ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি সংক্রমণের বিস্তার রোধ করতে সহায়তা করে।

৪। চোখের মার্জিনের স্যাঁতসেঁতে ময়লা আলগা করতে তুলার বল ব্যবহার করতে হবে।

৫। চোখের বলের উপরে কখনও সরাসরি চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। চোখ থেকে ময়লা সাবধানে অপসারণ করা উচিত এবং যতবার প্রয়োজন চোখ পরিষ্কার করা উচিত।

৬। অনেক রোগী চশমা পরেন। চশমাগুলো বিছানার পাশে ড্রয়ারে রাখা উচিত। ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই চশমা কোথায় রেখেছেন ভুলে যান, তাই সর্বদা তাদের চশমা একই জায়গায় রাখতে হবে।

৭। চশমা পরিষ্কার করার সময় যত্নবান হতে হবে যেন চশমা ভেঙ্গে না যায়। উষ্ণ পানি এবং একটি নরম শুকনো কাপড় দিয়ে চশমা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

২০২৩



চিত্র ৪.১৮: চোখের ভিতরের কোণা থেকে বাইরের কোণার দিকে হাতের রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করানো

৪.৪.৮ কানের যত্ন

১। কানের মধ্যে পরিষ্কার করার জন্য একটি রুমালের পরিষ্কার কোণ ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে ঘুড়াতে হবে। এছাড়াও, কান পরিষ্কার করার জন্য একটি কটন-বাটও দরকারী।

২। যদি রোগী শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন, তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। ব্যাটারির যত্ন এবং সঠিক সন্নিবেশ কৌশল এই যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৩। শ্রবণশক্তি হ্রাস হল বয়স্কদের একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা। পরিবেশে সঠিকভাবে যোগাযোগ এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে রোগী সক্ষম কিনা সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪.৪.৯ পায়ের যত্ন

নখ কাটায় সহায়তা করার জন্য নিয়মিত রুটিন ঠিক করতে হবে। নখের ধার কমানোর জন্য নেইল ফাইলার ব্যবহার করতে হবে। কোথাও কোনো ফোলা দাগ বা ডিসকোলেশন আছে কিনা তা খেয়াল করতে হবে।

৪.৫ রোগীকে গোসল করাতে সহযোগীতা করা

বয়ষ্ক কিংবা বাচ্চারা নিজে নিজে গোসল করতে পারেনা। নিয়মিত গোসলের অভাবে রোগীর ত্বকে বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ দেখা দেয়। শরীরে দুর্গন্ধের তৈরি হয়। মেজাজ খিটখিটে লাগে। এমনকি খাবারেও অরুচির তৈরি হয়। ঘুমের ব্যঘাত ঘটে। যার ফলে ক্লান্তি ও অবসাদ ঝেকে বসে। তাই রোগীকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গোসল করানো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিচে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

৪.৫.১ বয়স ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাহকের গোসলের পদ্ধতি

ব্যক্তির কতটা সহায়তা ও তদারকি প্রয়োজন, তার গোসলের রুটিন, তার জন্য পছন্দনীয় বা উপযুক্ত গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে, ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে এবং তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যের ফাইল দেখে জেনে নিয়ে কাজ করতে হবে ।

৪.৫.২ শাওয়ার বাথ/টাব বাথ (সম্পূর্ণ গোসল)

গোসলের পূর্ব প্রস্তুতি:

১। পুরুষ রোগীকে পুরুষ কেয়ারগিভারদের দ্বারা গোসল করিয়ে দেওয়া উচিত।

২। মহিলা রোগীকে মহিলা কেয়ারগিভারদের দ্বারা গোসল করিয়ে দেওয়া উচিত।

৩। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।

১০১৩

৪। দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলতে, স্থান বদলানোর সময় একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হতে পারে।

৫। যদি প্রয়োজন হয়, তবে টাবের পাশেই একটি চেয়ারে রেখে টাবের ভিতরে যাওয়া ও টাব থেকে উঠে আসার জন্য সহায়তা করতে হবে।

৬। শাওয়ারে গোসলের ক্ষেত্রে, একটি শাওয়ার চেয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭। ব্যক্তি হইলচেয়ার ব্যবহারকারী হলে, ব্যক্তিকে টাবে বা শাওয়ার চেয়ারে নেয়ার পর হইলচেয়ারটি সরিয়ে ফেলতে হবে।

৮। ঘরটি উষ্ণ এবং আবর্জনামুক্ত হওয়া উচিত।

৯। প্রয়োজনে ব্যবহারের আগে টাব পরিষ্কার করে নিতে হবে।

১০। পানি দিয়ে টাব অর্ধেক ভরাট করে নিতে হবে।

১১। ব্যক্তিকে টাব বা ঝরণাতে দেওয়ার আগে পানির তাপমাত্রা কনুই দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে। পানির তাপমাত্রা খুব বেশি হলে পুড়ে যেতে পারে।

১২। কম ফেনা হয় বা সহজে ধুয়ে যায় এমন সাবান নির্বাচন করতে হবে। মেডিকেটেড সাবান হলে উত্তম।

১৩। ব্যক্তির আগে গোসলের জায়গায় সমস্ত সরঞ্জাম আছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে।

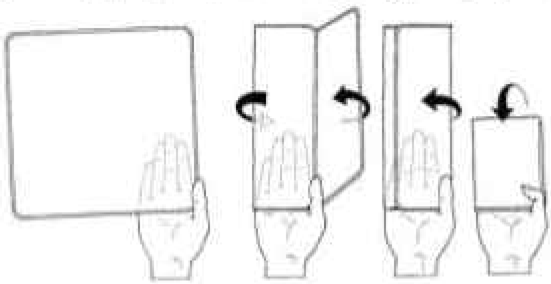
প্রক্রিয়া:

১। যতটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রেখে, প্রয়োজন মতো পোশাক অপসারণ করতে ব্যক্তিটিকে সহায়তা করে সাথে সাথেই ত্বক পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ত্বকের কোনো সমস্যা লক্ষ্য করলে তা ফাইলে রেকর্ড করতে হবে।

২। হাত ধুয়ে শুকিয়ে গ্লাভস পরতে হবে।

৩। পানির তাপমাত্রা পরীক্ষা করার পরে ব্যক্তিকে টাবে বা শাওয়ারেও যেতে সহায়তা করতে হবে।

৪। যদি সম্পূর্ণ সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে:



চিত্র ৪.১৯: হাতের চারপাশে একটি ওয়াশ ক্লথ পেঁচিয়ে নেয়ার পদ্ধতি

১। হাতের চারপাশে একটি ওয়াশ ক্লথ পেঁচিয়ে নাও অথবা নরম স্ক্রাব ফোম বা স্পঞ্জ হাতে নিতে হবে।

২। চোখের অঞ্চল থেকে পরিষ্কার করা শুরু করে ওয়াশ ক্লথ বা নরম স্ক্রাব ফোম বা স্পঞ্জে সাবান লাগিয়ে নিতে হবে।

৩। পূর্বের নির্দেশনা অনুযায়ী মুখমন্ডল, চোখ, হাত, পা, বগল পরিষ্কার করতে হবে।

৪। গোপনাঙ্গ ধোয়া শেষ করতে হবে।

৫। ত্বকের দুটি পৃষ্ঠতল যেখানে মিলবে সেখানে ভালোভাবে পরিষ্কারের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে (যেমন- স্তনের নীচে, পায়ের আঙুলের মধ্যে, উরুর মাঝে) ।

৬। প্রয়োজনে চুলে শ্যাম্পু করে চুল ভালো করেও ধুয়ে ফেলতে হবে।

৭। টাব বা ঝরণা থেকে ব্যক্তিটিকে পিচ্ছিল রোধক পাপোষের উপরে আনতে সাহায্য করতে হবে।

৮। টাব বা শাওয়ারের পাশে রাখা চেয়ারে তাকে বসতে সহায়ত করতে হবে।

১০। চুলসহ সম্পূর্ণ শরীর শুকাতে সহায়তা করতে হবে।প্রয়োজনে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।
২। পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মাবলি অনুসরণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করতে হবে।
১২। ব্যক্তিকে তার কক্ষে নিয়ে সাথে যেতে হবে।

৪.৫.৩ বেডবাথ/স্পঞ্জবাথ (আংশিক গোসল)

গোসলের পূর্ব প্রস্তুতি:

১। কখনও কখনও সম্পূর্ণ বাথ একটি রোগীর জন্য খুব ক্লান্তিকর হয়। তাই, মুখ, হাত, বগল, যৌনাঙ্গ, পিঠ এবং নিতম্বকে অন্তর্ভুক্ত করে আংশিক গোসল বা বেডবাথ বা স্পঞ্জবাথ দেওয়া যেতে পারে।
২। গোসলের সময় রোগীর অবস্থান তার শারীরিক অবস্থা এবং তার চলাফেরার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।
৩। শরীরে কোনো ব্যান্ডেজ থাকলে, ঐ স্থানের ত্বক পরিষ্কারের জন্য ব্যান্ডেজ অপসারণ করা যাবে কিনা এবং সেগুলো পুনরায় লাগিয়ে দিতে হবে কিনা তা আগে থেকেই চিকিৎসার ফাইল থেকে জেনে নিতে হবে।
৪। দু'টি বড় বোলে গরম পানি ভরে নিতে হবে। একটি পরিষ্কার করে ধোয়ার জন্য এবং অন্যটি মুছার জন্য ব্যবহৃত হয়। পানির তাপমাত্রা ৯০-১০৫০F হতে হয়। পানির তাপমাত্রা কনুই দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৫। ঘরটি উষ্ণ এবং আবর্জনামুক্ত হওয়া উচিত।
৬। কম ফেনা হয় বা সহজে ধুয়ে দেওয়া যায় এমন সাবান ও শ্যাম্পু নির্বাচন করতে হবে। মেডিকেটেড সাবানও শ্যাম্পু হলে উত্তম। শ্যাম্পু করার সময় বিছানাটি ভিজে যাওয়ার হাত থেকে বাচাতে রোগীর মাথার নিচে একটি অতিরিক্ত গামছা রেখে দিতে হবে।
৭। ব্যক্তিকে আনার আগে গোসলের জায়গায় সমস্ত সরঞ্জাম আছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে।
৮। তিনটি পরিষ্কার তোয়ালে এবং দুইটি ওয়াশ ক্লথ প্রস্তুত রাখতে হবে।
৯। তোয়ালে, ওয়াশক্লথ, পানির বোল এবং সাবান কোনো পর্টেবল ট্রলিতে হাতের কাছে রাখা যেতে পারে।
১০। রোগীর পিঠের নীচে দুটি তোয়ালে রেখে বিছানা ভিজে যাওয়া রোধ করতে হবে এবং প্রক্রিয়া চলাকালীন রোগীকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে।
১১। রোগীকে একটি পরিষ্কার শিট বা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।



চিত্র ৪.২০: যখন যেই অংশ পরিষ্কার করা হবে সেই অংশ শিটের নিচ থেকে বের করে নিতে হবে

১২। রোগীর পোশাক অপসারণ করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে এই ধাপটি কিছু রোগীর জন্য বিব্রতকর হতে পারে, তাই দ্রুত এবং উদ্দেশ্যমূলক মনোভাবের সাথে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রক্রিয়া:

১। যতটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রয়োজন মতো পোশাক অপসারণ করতে ব্যক্তিটিকে সহায়তা করতে হবে। সাথে ত্বক পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে এবং ত্বকের কোনো সমস্যা লক্ষ্য করলে তা ফাইলে রেকর্ড করতে হবে।

২। হাত ধুয়ে শুকিয়ে গ্লাভস পরতে হবে।

৩। সম্ভব হলে নিরাপদ উচ্চতায় বিছানা উঠিয়ে নিতে হবে। সম্ভব না হলে, মাথার নিচে বেশি বালিশ দিয়ে নিরাপদ উচ্চতায় রোগীকে উঠিয়ে নেয়া যেতে পারে।

৪। তোয়ালে এবং / অথবা ডিসপোজেবল প্যাড দিয়ে বিছানাপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। যেখানে কাজ করা হবে সেই জায়গার নীচে একটি তোয়ালে রাখতে হবে।

৫। গোসলের আগে রোগীকে বিছানায় ইউরিনাল সরবরাহ করে তাতে মূত্রত্যাগ করতে বলতে হবে।

৬। রোগীকে একটি পরিষ্কার শিট বা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। যে অংশটি পরিষ্কার করা হবে কেবল সেখানকার শিট বা তোয়ালে এবং পোশাক সরিয়ে ফেলতে হবে।

৭। বিছানায় গোসলের সময় বোলের পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে। প্রতিবার যখন বোলের পানি পরিবর্তন করা হবে, তখন সর্বদা পানির তাপমাত্রা পুনরায় পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৮। হাতের চারপাশে একটি ওয়াশ ক্লথ পেঁচিয়ে নিয়ে অথবা নরম স্ক্রাব ফোম বা স্পঞ্জ হাতে নিয়ে নিতে হবে। প্রথমে চোখ থেকে শুরু করতে হবে। পরিষ্কার হালকা গরম পানিতে পাতলা ছোট রুমাল ভিজিয়ে চোখের পরিধি (চোখের চারপাশের বৃত্তাকার অঞ্চল) ভালোভাবে মুছে দিতে হবে। জ্বালাপোড়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে সাবান ব্যবহার না করাই ভালো। চোখের ভিতরের কোণা থেকে বাইরের কোণার দিকে হাতের রুমালটি পরিচালিত করতে হবে।

৯। পুরো শরীরের জন্য একই পরিষ্কারকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে রোগীর ত্বকে সাবান বা সাবান পানি প্রয়োগ করতে হবে। ময়লা এবং ব্যাকটিরিয়া অপসারণ করতে ১ম ওয়াশ ক্লথ দিয়ে আলতো করে স্ক্রাব করে একটি পানির বোলে ওয়াশ ক্লথ রাখতে হবে। অপর পানির বোলে দ্বিতীয় ওয়াশক্লথ ভিজিয়ে ভালোমত চিপে নিয়ে শরীরের সাবান মুছে ফেলতে হবে। তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গাগুলো শুকনো করে নিতে হবে। ওয়াশ ক্লথগুলো যদি বেশি ময়লা হয়ে যায় তবে পরিষ্কার করে বদলিয়ে নাওতে হবে।

১০। ধীরে ধীরে সাবান পানি দিয়ে রোগীর মুখ, কান এবং ঘাড় ধুয়ে ফেলতে হবে। আলাদা ওয়াশ ক্লথ দিয়ে সাবান মুছে ফেলে তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গাগুলো শুকনো করতে হবে।

২। রোগীর বাম হাত এবং কাঁধ ধুয়ে নিতে হবে- শরীরের বামদিকে শীটটি নীচে পশ্চাদ দেশ পর্যন্ত ভাঁজ করে উন্মুক্ত বাহুর নীচে একটি তোয়ালে রাখতে হবে। রোগীর কাঁধ, বগল, বাহু এবং হাত ধুয়ে মুছে ফেলে তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গা গুলো শুকনো করতে হবে। রোগীকে উষ্ণ রাখতে শীটটি নিয়ে পুনরায় ঢেকে দিতে হবে।



চিত্র ৪.২১: রোগীর বাম হাত এবং কাঁধ ধুয়ে নাও

১২। রোগীর ডানহাত এবং কাঁধ ধুয়ে নিতে হবে- শরীরের ডানদিকে শীটটি নীচের পশ্চাদেশ পর্যন্ত ভাঁজ করে উন্মুক্ত বাহুর নীচে একটি তোয়ালে রাখতে হবে। রোগীর কাঁধ, বগল, বাহু এবং হাত ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গাগুলো শুকনো করে রোগীকে উষ্ণ রাখতে শীটটি দিয়ে পুনরায় ঢেকে দিতে হবে।

১৩। রোগীর ধড় ধুয়ে ফেলতে হবে- শীটটি কোমরের নিচে ভাঁজ করে ধীরে ধীরে বুক, পেট এবং পাশগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে। রোগীর ত্বকের যে কোনো ভাঁজগুলোর মধ্যে যেহেতু ব্যাকটিরিয়া আটকা পড়ে, তাই সেখানে সাবধানে ধুয়ে ফেলতে ভুলা যাবেনা। তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গাগুলো শুকনো করতে হবে। রোগীকে উষ্ণ রাখতে শীটটি দিয়ে পুনরায় ঢেকে দিন।

১৪। রোগীর পা ধুয়ে ফেলতে হবে- রোগীর ডান পায়ের কোমর পর্যন্ত উন্মুক্ত করে পা ধুয়ে মুছে শুকিয়ে নিতে হবে। ডান পা শীটটি দিয়ে পুনরায় ঢেকে দিয়ে বাম পা উন্মুক্ত করে ধুয়ে মুছে শুকিয়ে নিতে হবে। বাম পা শীটটি দিয়ে পুনরায় ঢেকে দিতে হবে।

১৫। পিঠ ও নিতম্ব পরিষ্কার করতে হবে- পানির বোল গুলো খালি করে পরিষ্কার পানি দিয়ে পুনরায় ভরে নিতে হবে। সম্ভব হলে তাদেরকে এক পাশে ফিরিয়ে রোগীর পিঠ এবং নিতম্ব ধুয়ে দিতে হবে। রোগীর পুরো পেছনের অংশটি উন্মুক্ত করতে শীটটি ভাঁজ করে রোগীর পিঠ, নিতম্ব এবং পা গুলো ধুয়ে মুছে শুকিয়ে ফেলতে হবে।

১৬। গোপনাঙ্গ ধুয়ে ফেলতে হবে।

১৭। রোগীর চুল ধুয়ে-মুছে শুকিয়ে ফেলতে হবে।

১৮। কাজ শেষ হয়ে গেলে, রোগীকে পরিষ্কার কাপড় পরাতে হবে। প্রবীণদের ত্বক শুকিয়ে যাওয়ার ঝোঁক থাকে, তাই কাপড় পরানোর আগে হাত এবং পায়ে লোশন লাগিয়ে দিতে হবে।

১৯। ব্যক্তির চুল আঁচড়িয়ে প্রসাধনী এবং শরীরে অন্যান্য ব্যবহার্য পণ্যগুলো রোগীর পছন্দ অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে।

৪.৫.৪ শ্যাম্পু করা

১। রোগীকে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে হবে।

২। হাত ধুয়ে শুকিয়ে গ্লাবস পরতে হবে।

৩।রোগীদের পছন্দনীয় পণ্যগুলো কি, তা জেনে নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে, রোগীর কোন পণ্যগুলোতে অ্যালার্জি নেই।

১০১৩

৪। রোগীকে সোজা করে শোয়াতে হবে। রোগীর মাথা এবং কাঁধের নীচে একটি পানিরোধক প্যাড বা তোয়ালে রেখে এই অঞ্চলটি শুকনো এবং উষ্ণ রাখার জন্য কাঁধ এবং বুকের জায়গার উপরে একটি তোয়ালে রাখতে হবে। রোগীর বাকী অংশটি কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫। রোগীর চোখ, কান এবং মুখ ভিজে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। মগ ব্যবহার করে পরিষ্কার, উষ্ণ পানির মাধ্যমে চুলগুলো ভালোমত ভিজিয়ে নিতে হবে।

৬। হাতে শ্যাম্পু নিয়ে দুইহাতে ঘষতে হবে। রোগীর মাথার সামনের দিক থেকে চুলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শ্যাম্পু ম্যাসাজ করত হবে। আঙুলের মাথা দিয়ে বৃত্তাকার গতি ব্যবহার করে রোগীর মাথার ত্বকে শ্যাম্পু ম্যাসেজ করতে হবে। নখ দিয়ে ম্যাসাজ করলে মাথার ত্বক ক্ষত হতে পারে।

৭। পানি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত চুল ধুতে থাকতে হবে। রোগীর চোখের ও কানের সুরক্ষার জন্য রোগীর কপালে মাথার ত্বক সোজাসুজি ধুয়ে ফেলতে হবে।

৮। কন্ডিশনার ব্যবহার করা হলে, পূর্বের তিনটি পদক্ষেপ পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৯। শুকনো তোয়ালে ব্যবহার করে রোগীর মুখ, মাথা এবং ঘাড় থেকে পানি মুছতে হবে । প্রয়োজনে নিরাপদ দূরত্ব থেকে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০। ব্রাশ ব্যবহার করে চুল আঁচড়ে দিতে হবে।



চিত্র ৪.২২: শ্যাম্পু করার পদ্ধতি

৪.৫.৫ গোপনাঙ্গের যত্ন

পুরুষদের গোপনাঙ্গের যত্ন

১। রোগীকে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে হবে।

২। শরীরের অন্যান্য অংশ যেই গ্লাবস দিয়ে পরিষ্কার করা হয় সেটা খুলে হাত ধুয়ে শুকিয়ে নতুন গ্লাবস পরতে হবে।

৩। রোগীদের পছন্দনীয় পণ্যগুলো কি তা জেনে নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে, রোগীর কোনো নির্দিষ্ট কিছুতে এলার্জী আছে কিনা।

৪। সুন্নতে খাৎনা না হয়ে থাকলে পুরুষাঙ্গের ফোরস্কিন আলতো করে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সম্পূর্ণ অঙ্গ ধুয়ে নিতে হবে। প্রতিটি স্ট্রোকের জন্য ওয়াশক্লথের একটি পরিষ্কার অংশ ব্যবহার

করতে হবে। ফোরস্কিনটি আলতো করে আবার তার স্বাভাবিক অবস্থানে ঠেলে দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে ভুলে যাওয়া যাবে না।

মহিলাদের গোপনাঙ্গের যত্ন:

১। রোগীকে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে হবে।

২। শরীরের অন্যান্য অংশ যেই গ্লাভস দিয়ে পরিষ্কার করা হয় সেটা খুলে হাত ধুয়ে শুকিয়ে নতুন গ্লাভস পরতে হবে।

৩। রোগীদের পছন্দনীয় পণ্যগুলো কি তা জেনে নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে, রোগীর কোনো নির্দিষ্ট কিছুতে এলার্জী আছে কিনা।

৪। একক স্ট্রোক দিয়ে পেরিনিয়াম অঞ্চলটি সামনে থেকে পিছনে ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রতিটি স্ট্রোকের জন্য ওয়াশক্লথের একটি পরিষ্কার অংশ ব্যবহার করতে হবে। একপাশে ল্যাবিয়া মাজোরা মুছে তারপরে অন্য ল্যাবিয়া মাজোরা মুছতে হবে। ল্যাবিয়া আলাদা করে ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিটি স্ট্রোকের জন্য ওয়াশক্লথের একটি পরিষ্কার অংশ ব্যবহার করতে হবে। একটি পরিষ্কার অংশ ব্যবহার করে প্রতিটি পাশের অংশ পিছনের দিকে মুছতে হবে। যোনিটির প্রারম্ভ পর্যন্ত মধ্য থেকে নীচপর্যন্ত মুছতে হবে। যোনি এবং মলদ্বারের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি পরিষ্কার করে সামনে থেকে পিছনে ধৌত করতে হবে।

৪.৬ রোগীকে সাধারণ গৃহস্থালীর কাজকর্মে সহায়তা করা।

একটি বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হচ্ছে সাধারণ গৃহস্থালির কাজের অংশ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাড়িকে সংক্রমণ এবং কীটপতঙ্গ মুক্ত রাখে এবং রোগীকে শারীরিক, মানসিক প্রশান্তিতে রাখতে সাহায্য করে। এই চ্যাপ্টারে আমরা রোগীর বাড়িতে কিভাবে সাধারণ গৃহস্থালির কাজ-কর্মে সহযোগীতা করতে পারা সেই ব্যাপারে আলোচনা করবো।

৪.৬.১ একজন পরিচর্যাকারী গৃহস্থালির কি কি করেন?

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিচর্যাকারী, গৃহকর্মী, এবং বেবিসিটারদের প্রায় একই রকম কাজ রয়েছে। তাদের সাধারণ কাজগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো সহযোগীতাগুলো অন্তর্ভুক্ত:

১। রান্নাঘরের কাজ, ২। খাবার কেনাকাটা, ৩। খাবার রান্না করা ৪, খাবার পরিবেশন করা ৫। ঘর পরিষ্কার করা, ৬। থালা-বাসন ধোয়া। ৭। কাপর চোপড় লন্ড্রি করা। ৮। শিশু যত্ন, যার মধ্যে ডায়াপার পরিবর্তন, স্নান এবং তত্ত্বাবধান করা। ৯। প্রবীণদের যত্ন, যার মধ্যে স্নান, সাহচর্য এবং ডাক্তারের সাথে দেখা করার মত কাজ।

৪.৭ খাওয়ানোর জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও অবস্থান

সাধারণ পদ্ধতি

যদি গ্রাহক নড়াচড়া করতে পারে এবং গুরুতর অসুস্থ না হয়, তাহলে-

১। নিশ্চিত করতে হবে যে, অচলাবস্থায় গ্রাহক যেন মাথা, পিঠ ও ঘাড় সোজা করেও বসতে পারে। দরকার হলে পিছনে বালিশ দিয়ে পিছনের দিকে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করতে হবে।

২। মাথা সামনের দিকে নিয়ে চিবুক সামান্য নিচু করতে বলতে হবে।

৩। প্যারালাইসিস ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে খাবার গলধকরণ করতে অসুবিধা হতে পারে। কারো কারো একপাশ বা উভয় পাশই দুর্বল হতে পারে। যেপাশ বেশি দুর্বল সেই পাশে সাপোর্ট দিতে হবে।

৪। খাওয়ানোর সময় ব্যক্তির চোখের লেভেল বরাবর বা তার নীচে বসিয়ে নিতে হবে।

৫। খাওয়ানোর সময় ব্যক্তিকে ফিডিং গাউন পরিয়ে নিতে হবে।

৬। ব্যক্তির মুখে স্নায়ুজনিত কোনো দুর্বলতা থাকলে, অপেক্ষাকৃত সবল পাশে বসে খাওয়াতে হবে। ব্যক্তির মুখের অপেক্ষাকৃত সবল অংশে খাবার রাখতে হবে।

৭। ব্যক্তি নিজের হাতে খেতে পছন্দ করলে তার চোখের ভিজ্যুয়াল ফিল্ড সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এমনভাবে তার সামনে খাবার রাখতে হবে যেন তিনি খাবারের স্থান বুঝতে পারেন।

৮। শয্যাশায়ী ব্যক্তিদের বিছানায় খাবার পরিবেশন করতে ট্রলি ব্যবহার করতে হবে।



চিত্রঃ ৪.২৩: রোগীকে খাওয়ানোর সাধারণ পদ্ধতি

ব্যক্তির ডিজফ্যাজিয়া বা খাবার গলধকরণে সমস্যা বা মুখে স্নায়ুজনিত কোনো দুর্বলতা থাকলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো খেয়াল করতে হবে:

১। কাশি / দমবন্ধ, ২। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, ৩। খাবারের জন্য দীর্ঘ সময় নেওয়া / ঘুমিয়ে পড়া, ৪। খাওয়া বা পান করার সময় অসুবিধা, ৫। খেতে অনীহা, ৬। খাবার মুখে আটকে যাওয়া, ৭। গালে খাবার চেপে রাখা ,৮। খাবার / পানীয় মুখ থেকে পড়া

৪.৮ নাজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং

১। গ্রাহককে পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করতে হবে।

২। একজন সহকারী পাশে রাখতে হবে।

৩। হাত ধুয়ে নিতে হবে।

৪। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরে সহকারীকে গ্লাভস পড়তে বলতে হবে।

৫। খাওয়ানোর সময় রোগীকে ফিডিং গাউন পরিয়ে নিতে হবে।

৬। খাওয়ানোর সময় রোগীকে ৩০ ডিগ্রী কোণে বসিয়ে নিতে হবে।

৭। হাতের কাছে পরিষ্কার ট্রলির উপরে খাওয়ানোর সরঞ্জামগুলো রাখতে হবে।

৮। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে প্রস্তাবিত খাদ্যের উপাদান, পরিমাণ ও সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে।



চিত্র ৪.২৪: ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং পদ্ধতি

৪.৯ কাপড় ধৌত করা

পরনের বস্ত্র যদি শরীরের ঘাম বা সম্ভাব্য সংক্রামক উপকরণ দিয়ে নোংরা হয়, তবে এটিকে দূষিত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। ডিসপোজেবল গ্লাভস পরে ডিটারজেন্ট এবং ব্লিচ দ্রবণ পানিতে মিশিয়ে আইটেমগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪.১০ থালা-বাসন ধৌতকরণ

১। গরম পানি এবং সাবান দিয়ে থালা বাসন ধুয়ে ফেলতে হবে।

২। চূড়ান্তভাবে কাপড় ধোয়ার আগে পানিতে জীবাণুনাশক হিসেবে প্রয়োজনমত ক্লোরিন বিচ যোগ করে এই দ্রবণে থালা-বাসন, কাচের পাত্র এবং অন্যান্য পাত্রগুলো অন্তত এক মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে।

৩। থালা-বাসনগুলো আবার গরম পানিতে ধুয়ে ফেলে বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।

৪.১০.১ রান্নাঘর পরিষ্কার করা

১। রান্নাঘর, রান্নাঘরের সারফেস, কাউন্টার টপস, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার পরিষ্কার করার পর স্যানিটাইজ করার জন্য ব্লিচিং দ্রবন ব্যবহার করতে হবে।

২। দীর্ঘ সময় অথবা বার বার স্যানিটাইজ সল্যুশন ব্যবহার করা লাগলে হাতে গ্লোভস পরে নিতে হবে।

৩। ব্লিচিং দ্রবন ব্যবহারের পূর্বে নির্দেশাবলি এবং সতর্কতাগুলো ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে।

৪.১১ রোগীকে হালকা ব্যায়াম করানো

বাড়িতে শারীরিক অনুশীলনের গুরুত্ব

১। শারীরিক ও মানসিক প্রফুল্লতা লাভ করে।

২। পেশী শক্তি এবং হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে পরে যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়ক হতে পারে কারণ এটি ভারসাম্যও উন্নত করতে পারে। অস্টিওপরোসিস এবং ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে।

৩। নিয়মিত কার্ডিওভাসকুলার ব্যায়াম স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি হ্রাস করে।

৪। ডিমেনেশিয়া হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৫।রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৬। অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি রোধ করে।

প্রস্তুতি:

১। চিকিৎসক বা ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী অনুশীলনের ধরণ নির্বাচন করতে হবে।

২। ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ও পছন্দ বিবেচনায় রাখৎ হবে।

৩। অনুশীলনের ধরণ ও পদ্ধতি ব্যক্তিকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে।

৪। সম্ভব হলে ব্যায়ামের পোশাক পরতে উৎসাহিত করতে হবে।

৫। এই অনুশীলন করানোর জন্য ব্যয়বহুল সরঞ্জাম বা জিমে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

৬। প্রয়োজনে ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্য নিতে হবে।

৪.১১.১ কোর কি ?

কোর বলতে পেটের পেশী, পিছনের পেশী এবং নিতম্ব শ্রোণির পেশী নিয়ে গঠিত অংশকে বুঝায়। কোর দেহের স্ট্যাবিলাইজার হিসাবে কাজ করে, মেরুদন্ডকে সুরক্ষা দেয় এবং প্রায় প্রতিটি শারীরিক কাজের সময় কাজে লাগে।

৪.১১.২ বয়স্ক ও অসুস্থ রোগীদের জন্য সেরা কোর অনুশীলন :

১। সাইড বেন্ড

ক। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসিয়ে তার এক হাত মাথার পিছনে রাখতে হবে। অন্য হাত প্রসারিত করতে হবে।
খ। পাশের দিকে এমনভাবে ব্যক্তিকে ধরে বাকাতে হবে বা তিনি নিজে পারলে তাকে বাকতে নির্দেশনা দিতে হবে, যেন তিনি তার প্রসারিত হাত দিয়ে মেঝেটি স্পর্শ করার চেষ্টা করতে পারেন।



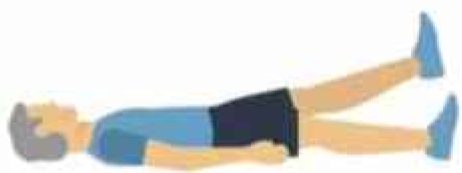
চিত্র ৪.২৫: সাইড বেন্ড

গ। তারপরে প্রারম্ভিক অবস্থানে ফিরে আসতে হবে।

ঘ। দুইপাশে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

২। পা উত্তোলন

১। মেঝেতে একটি কার্পেটে বা ইয়োগা ম্যাট বিছিয়ে ব্যক্তিকে শুয়ে পড়তে সাহায্য করতে হবে।



চিত্র ৪.২৬: পা উত্তোলন

২। মেঝে থেকে একটি পা পাঁচ ইঞ্চি উপরে উঠিয়ে প্রায় তিন সেকেন্ডের জন্য এই ভঙ্গি রাখতে হবে।

৩। অন্য পায়েও এটা পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৩। উড চপিং পোজ

উড চপিং পোজ নামকরণ করা হয়েছে কারণ অনুশীলনটি সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে দেখে মনে হয় যে তিনি কাঠ কাটছেন।



চিত্র ৪.২৭: উড চপিং পোজ পদ্ধতি

১। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসাতে হবে।

২। ব্যক্তি দুই হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারবে এমন একটি বল বা হালকা বস্তু হাতে দিয়ে তাকে তার মাথার বাম দিকে দুই বাহু উপরে উঠাতে বলতে হবে।

৩। তির্যকভাবে ব্যক্তির শরীরে আড়াআড়িভাবে দুই বাহু একসাথে ডান দিকে নিচে নামাতে সাহায্য করতে হবে।

৪। প্রারম্ভিক অবস্থানে ফিরে গিয়ে বিপরীত পাশে প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৫। প্রতি পাশে প্রক্রিয়াটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করৎ হবে।

৪.১১.৩ বয়স্ক ও অসুস্থ রোগীদের পায়ের অনুশীলন

১। গোড়ালি ঘুড়ানো:

১। ব্যক্তির পায়ের গোড়ালী চিত্রের ন্যায় ঘুড়াতে সাহায্য করতে হবে।



চিত্র ৪.২৮: গোড়ালি ঘুড়ানো



চিত্র ৪.২৯: হাঁটু এক্সটেনশন

২। হাঁটু এক্সটেনশন:

১। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসাতে হবে।

২। হাঁটু আস্তে আস্তে সামনের দিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করতে হবে।

৩। এতে ব্যক্তির কাফ মাসলেরও ভালো অনুশীলন হবে।

৩। হাঁটু ফ্লেক্সন ও নিতম্ব এক্সটেনশন:

১। সম্ভব হলে ব্যক্তিকে দাড় করিয়ে নিতে হবে।

২। কোমরে দুই হাত রাখতে বলতে হবে।

৩। পা সামনের দিকে নিয়ে হাঁটু বাকা করতে সাহায্য করতে হবে।



চিত্র ৪.৩০: হাঁটু ফ্লেক্সন



চিত্র ৪.৩১: উঠা-বসা

৪। উঠা-বসা:

১। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসাতে হবে।

২। সামনের দিকে কাঁধ ও হাত সোজা করে রাখতে বলতে হবে, যেন পিঠ সোজা থাকে।

৩। স্বাভাবিক নিয়মে বসা থেকে উঠতে ও দাড়ানো থেকে বসতে বলতে হবে।

৪। প্রক্রিয়াটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৫। হিল স্লাইড:

১। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসাতে হবে।

২। শরীরের সামনে দিকে এক পা প্রসারিত করাতে হবে, যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো সামনের দিকে নির্দেশিত থাকে।

৩। প্রসারিত পায়ের পাদদেশকে সমতল রাখতে হবে, মেঝের উপড়ে চাপ দিয়ে পা'টি ধীরে ধীরে শরীরের দিকে টেনে আনতে হবে যতক্ষণ না এটি আগের অবস্থানে পৌঁছায়।

৪। পা আগের অবস্থানে ফিরে গেলে অপর পায়ে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

৫। এভাবে প্রক্রিয়াটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।



চিত্র ৪.৩২: হিল স্লাইড

৪.১৫.৪ -ইয়োগা/যোগ ব্যায়াম:

উপকারিতা:

১। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

২। শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখে।

৩। বাত, ব্যথা এবং প্রদাহ হ্রাস করে।

৪। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৫। আইবিএসের মতো হজমজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৬। ঘুমের মান উন্নত করে।

৭। শোক শিতিল করার একটি উপায়।

৮। হতাশা এবং উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

প্রস্তুতি:

১। ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন করতে হবে যে, তিনি যোগ ব্যায়ামের জন্য উপযুক্ত কিনা। প্রয়োজনে চিকিৎসক ও যোগ ব্যায়ামের প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করতে হবে।

২। যোগব্যায়ামের জন্য আরামদায়ক, প্রসারিত পোশাক নির্বাচন করতে হবে।

৩। যোগব্যায়ামের জন্য আরামদায়ক ঢিলেঢালা পোশাক লাগবে।

৪। একজন যোগ্য প্রশিক্ষকের সন্ধান করতে হবে।

৫। অল্প অল্প করে শুরু করতে পরামর্শ দিতে হবে।

৬। প্রশিক্ষক ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা বুঝে যোগাসন নির্বাচন করতে হবে।

জব ১: রোগীকে ওরাল হাইজিন বজায় রাখতে সহযোগীতা করা

পারদর্শীতার মানদন্ড:

১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে নিতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী মুখগহবরের যত্ন নেয়ার জন্য একটি জায়গা উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

৩। জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ করতে হবে।

৪। কাজে সহায়তা করার জণ্য রোগীকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

৫। ওরাল হাইজিং দেওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থানটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৬। ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত বিনে/বর্জ্য পাত্রে ফেলে দিতে হবে।

৭। কাজ শেষে রেকর্ড শীটে নথিভুক্ত ক্রতে হবে।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট

একটি পরিষ্কার ট্রেতে যে জিনিসগুলো থাকবে:

১। ম্যাকিংটোস এবং টাওয়েল (Mackintosh and Towel), ২। টুথব্রাশ এবং পেস্ট (Toothbrush and paste), ৩। মাউথ ওয়াশ সলিউশন (Mouth wash solution), ৪। এক কাপ পানি (A cup of water), ৫। ফেইস টাওয়েল (Face Towel), ৬। স্পঞ্জ ক্লোথ (Sponge Cloth), ৭। টাং ডিপ্রেসর (Tongue

depressor), ৮। গজ পিছ (Gauze piece), ৯। কিডনি ট্রে (Kidney Tray), ১০। এক বোল পরিষ্কার পানি (A bowl of clean water)

কাজের ধারা:

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।
২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।
৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে এবং প্রস্তুত করতে হবে।
৪। দুই হাতে ক্লিন গ্লোভস পড়ে রোগীকে ওরাল হাইজিং দেওয়ার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে এবং মৌখিক সম্মতি নিতে হবে।
৫। রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নিতে হবে।
৬। রোগীর মুখগহবর, দাঁত এবং গলার ভিতর পরীক্ষা করে একের পর এক ধাপ মেনে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।
৭। রোগীর বুকের উপর এবং থুতনীর নীচে ম্যাকিংটোস/ রাবার ক্লথবিছিয়ে নিতে হবে।
৮। রোগীকে বিছানা থেকে ৪৫ ডিগ্রী কোণে পজিশনিং করে মুখের বিপরীতে একটি কিডনি ট্রে ধরে রাখতে হবে।
৯। রোগী অচেতন থাকলে টাং ডিপ্রেসর দিয়ে মুখের চোয়াল হাঁ করে নিতে হবে।
১০। কাপের মধ্যে রাখা সলিউশন -এর মধ্যে জীবানুমুক্ত একপিছ গজ ভিজিয়ে নিংড়িয়ে নিয়ে রোগীর মাড়ি ও মুখের ভিতর উপর -নীচ করে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
২। সচেতন রোগীর ক্ষেত্রে টুথব্রাশে পেষ্ট লাগিয়ে ছবিতে নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।
১২। রোগীকে গ্লাসে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি দিয়ে কুলকুচি করে উক্ত পানি বেসিনে ফেলে দিতে বলতে হবে।
১৩। রোগীর মুখমন্ডল ফেইস টাওয়েল দিয়ে মুছে দিতে হবে।
১৪। ব্যবহৃত হয়েছে এমন জিনিসগুলো নির্ধারিত বিনে/বর্জ্য পাত্রে রাখতে হবে।
১৫। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
১৬। পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ এবং কাজের এলাকাটি পরিষ্কার করে নির্দেশনা অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতাঃ

১। কাজের সময় পিপিই ব্যবহার করতে হবে।
২। রোগীর সহযোগীতা পেতে পুরো পদ্ধতিটি বর্ণনা ও শেয়ার করতে হবে।
৩। ওরাল হাইজিং দেওয়ার পুর্বে রোগীকে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য পরিহার করার বিষয়টি অবহিত করতে হবে।
৪। রোগীর মুখে কোন আর্টিফিসিয়াল দাঁত কিংবা ডেঞ্চার আছে কিনা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে।
৫। কাজ শুরু করার পুর্বে রোগীকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং করে নিতে হবে।
৬। কাজটি সম্পন্ন করতে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি ওরাল হাইজিং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।

জব ২: বেডপ্যানের মাধ্যমে রোগীকে টয়লেটিং এ সহযোগীতা করা

পারদর্শীতার মানদন্ড:

১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী বেডপ্যানের মাধ্যমে টয়লেটিং এর জন্য রোগীর বিছানাকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

৩। জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ করতে হবে।

৪। কাজে সহায়তা করার জণ্য রোগীকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

৫। টয়লেটিং-এর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থানটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৬। ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত ময়লার বিনে /বর্জ্য ধারকে ফেলে দিতে হবে।

৭। কাজ শেষে রেকর্ড শীটে জবের আউটপুট নথিভুক্ত করতে হবে।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট/ ম্যাটেরিয়্যালস:

১। এক বেসিন ষ্ণ গরম পানি (A basin with warm water)

২। ডিস্পজেবল গ্লাভস (Disposable gloves)

৩। টয়লেট পেপার (Toilet paper)

৪। তোয়ালে (Towels)

৫। পরিষ্কার কাপড় বা ভিজা ওয়াইপস (Wash cloths or wet wipes)






১। ডিস্পজেবল গ্লাভ; ২। টয়লেট পেপার; ৩। টাওয়েল; ৪। ভিজা ওয়াইপস

কাজের ধারা:

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।

২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে তা প্রস্তুত করতে হবে।

৪। বেডপ্যানটিকে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে বেডপ্যান খালি করে নিতে হবে।

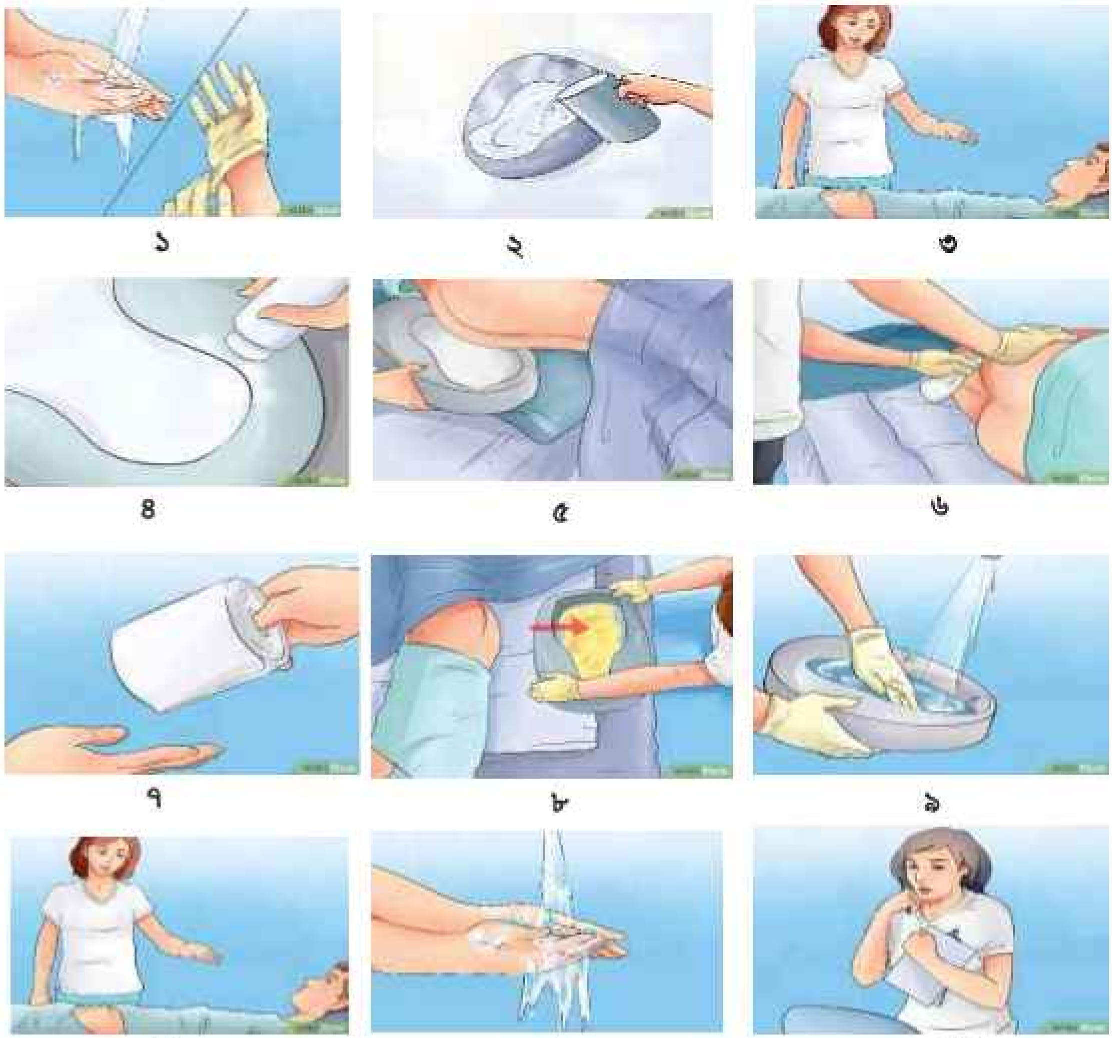
৫। বেডপ্যানের উপরিভাগে ট্যাল্কম পাউডার ব্যবহার করতে হবে যাতে রোগীর ত্বকের সাথে এটি এটে না যায়।

৬। বেডপ্যানের টয়লেট টিস্যু / পানি অথবা ভেজিটেবল অয়েল স্প্রে করতে হবে যাতে পরবর্তীতে বেডপ্যানটি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

৭। রোগী যদি সক্ষম হয় তাহলে তাকে উক্ত কাজে সহযোগীতা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

৮। ব্যক্তির গাউনটি উপরে তুলে ব্যক্তিকে তার বাটকের নীচে বেডপ্যানটি রাখতে বলতে হবে।

৯। যদি রোগী তার হিপ উপরে জাগাতে না পারে তাহলে তাকে পাশে ঘুরিয়ে তারপর বেডপ্যানের উপরে ফিরিয়ে দিতে হবে।



চিত্র ৪.৩৩ : বেডপ্যান দিয়ে টয়লেটিং এ সহযোগীতা করার ধারাবাহিক চিত্র

১০। যদি ব্যক্তি তার মলদ্বারের এলাকা পরিষ্কার করতে না পারে, তাহলে জায়গাটি পরিষ্কার করার জন্য একটি ভেজা টিস্যু ব্যবহার করতে হবে।

১১। যদি কোনো মহিলার প্রস্রাব হয় তবে সেই জায়গায় এক কাপ গরম পানি ঢেলে শুকিয়ে নিতে হবে।

১২। বেডপ্যানটি সরিয়ে পরিষ্কার করে খালি করে জমাকৃত বর্জ্য টয়লেটে ফেলতে হবে।

১৩। হাতের গ্লোভস ও ব্যবহৃত হয়েছে এমন জিনিসগুলো নির্ধারিত ময়লার বিনে/ বর্জ্য ধারকে রাখতে হবে।

১৪। ব্যক্তির হাত ধুয়ে নিজের হাত আবার ধৌত করতে হবে।

১৫। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৬। কাজের এলাকাটি পরিষ্কার করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতা:

১। কাজের সময় পিপিই ব্যবহার করতে হবে।

২। রোগীর সহযোগীতা প্রত্যাশা করতে পুরো পদ্ধতিটি অবহিত করতে হবে।

৩। যখন রোগীকে সরাতে সাহায্য করা লাগবে তখন নিজের নিরাপদ থাকার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। রোগীকে সাহায্য করার আগে, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত নির্দেশাবলি ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে হবে।

৫। কাজ শুরু করার পূর্বে রোগীকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং করে নিতে হবে।

৬। কাজটি সম্পন্ন করতে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি বেডপ্যানের মাধ্যমে রোগীকে টয়লেটিং করানোর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।

জব ৩: প্রাপ্ত বয়স্কদের ডায়াপার খোলা ও পরানো

পারদর্শীতার মানদন্ড:

১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী বেডপ্যানের মাধ্যমে টয়লেটিং এর জন্য রোগীর বিছানাকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

৩। জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ কর।

৪। তোমার কাজে সহায়তা করার জন্য রোগীকে প্রস্তুত রাখ।

৫। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থানটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৬। ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে ফেলে দিতে হবে।

৭। কাজ শেষে রেকর্ড শীটে জবের আউটপুট নথিভুক্ত কর।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট

১। স্ক্রীন, ২।টিস্যু পেপার, ৩। ডায়াপার , ৪। সাবান, ৫। তোয়ালে, ৬। বালতি, ৭। পাউডার, ৮। রাবার শীট, ৯। এন্টি র‌্যাশ ক্রীম, ১০। পরিষ্কার কাপড় বা ভিজা ওয়াইপস

কাজের ধারা:

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।

২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে তা প্রস্তুত করতে হবে।

৪। রোগীর সম্মতি গ্রহণ করুতে হবে।

৫। গোপনীয়তার সাথে রোগীর শরীর থেকে পুরনো/ ব্যবহৃত ডায়াপার খুলতে সহায়তা করতে হবে।

৬। ব্যবহৃত ডায়াপার সঠিক নিয়মে নির্ধারিত ময়লা রাখার বিন/ ঝুড়ি/ বর্জ্য ধারকে রাখতে হবে।

৭। রোগীকে পরিষ্কার করতে হবে।

৮। এ্যান্টির‌্যাশ ক্রীম ব্যবহার করতে হবে।

৯। গোপনীয়তার সাথে রোগীকে নতুন ডায়াপার পরতে সহায়তা করতে হবে।

১০। রোগীকে পূর্বের অবস্থানে স্থানা রিত করতে হবে।

১১। কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো সুশৃংখলভাবে পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

১২। হাতের গ্লাভস ও ব্যবহৃত হয়েছে এমন জিনিসগুলো নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে ফেলতে হবে।

১৩। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৪। কর্মক্ষেত্রটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতা:

১। কাজের সময় পিপিই ব্যবহার করতে হবে।

২। রোগীর সহযোগীতা প্রত্যাশা করতে পুরো পদ্ধতিটি বর্ণনা ও শেয়ার কর।

৩। রোগীকে সরাতে সাহায্য করার সময় নিজের নিরাপদ থাকার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। ডায়াপার খোলার পড়ে রোগীর বাটোকেকোন র‌্যাশ কিংবা কোনো লালচে ভাব আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৫। ৬ ঘন্টা পর পর ডায়াপার বদলিয়ে দিতে হবে। তবে এ সময়ের আগে মাঝে মাঝে চেক করতে হবে কোনো প্রসাব অথবা পায়খানা জমে আছে কিনা।

৬। রোগীকে সাহায্য করার আগে, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত নির্দেশাবলি ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে হবে।

৭। কাজ শুরু করার পুর্বে রোগিকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং করে নিতে হবে।

৮। কাজটি সম্পন্ন করতে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি রোগীর ডায়াপার খোলা ও পড়ানোর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

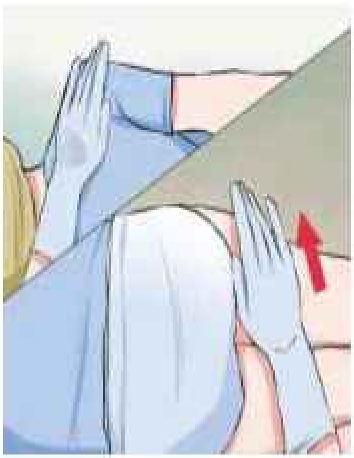
ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে পুরনো ডায়াপার খোলার ধাপ সমূহ দেওয়া হলো:


ক

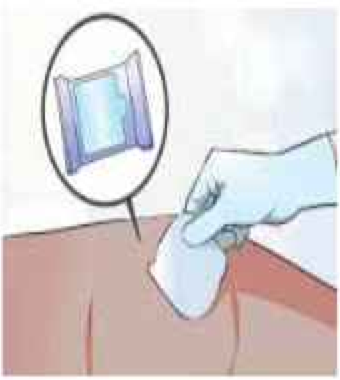

খ

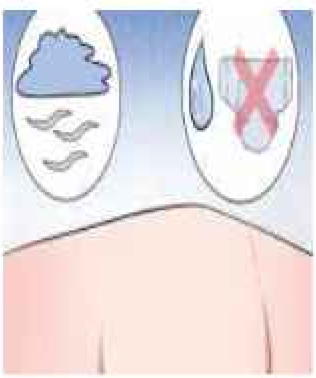

গ


ঘ


ঙ

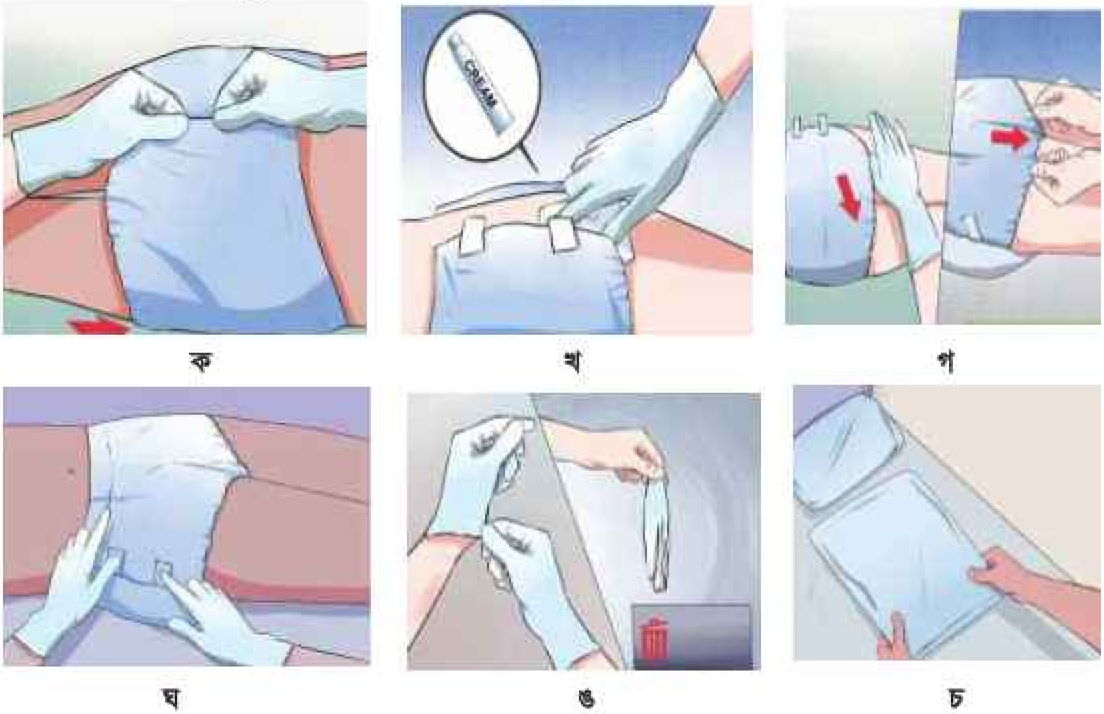

চ


ছ


জ

চিত্র ৪.৩৪ : পুরনো ডায়াপার খোলার ধাপসমূহ

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে নতুন ডায়াপার পড়ানোর ধাপসমূহ দেওয়া হলো:



চিত্র ৪.৩৫: নতুন ডায়াপার পড়ানোর ধাপসমূহ

জব ৪: রোগীকে পায়ের যত্নে সহায়তা করা

পারদর্শীতার মানদন্ড:

১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীর পা ধোয়ার জন্য আরামদায়ক জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

৩। জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ করতে হবে।

৪। কাজে সহায়তা করার জণ্য রোগীকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

৫। পায়ের যত্নের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থানটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৬। ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে ফেলে দিতে হবে।

৭। কাজ শেষে রেকর্ড শীটে জবের আউটপুট নথিভুক্ত করতে হবে।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট

১। ফুট ফাইলস (Foot Files), ২। কলাস রিমুভার (Callous Removers), ৩। কিউটিকল নিপারস (Cuticle Nippers), ৪। ফুট স্ক্রাব (Foot Scrubs), ৫। লোশন (Lotion), ৬। সুতির টাওয়েল (Cotton Towels), ৭। গামলা, ৮। স্পঞ্জ, ৯। সাবান

কাজের ধারা:

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।

২। আদর্শ নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরঞ্জাম সংগ্রহ করে তা প্রস্তুত করতে হবে।

৪। রোগীর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

৫। গোপনীয়তার সাথে রোগীর শরীর থেকে পুরনো/ ব্যবহৃত ডায়াপার খুলতে সহায়তা করতে হবে।

৬। একটি যথার্থ আকারের গামলায় হালকা গরম পানি নিয়ে নিতে হবে।

৭। রোগীকে ২-৩ মিনিট এই পানিতে পা ডুবিয়ে রাখতে বলতে হবে।

৮। নখে যদি কোনো ময়লা থাকে তা কলাস রিমুভার দিয়ে উঠিয়ে ফেলতে হবে।

৯। স্পঞ্জের সাহায্যে সাবান দিয়ে গ্রাহকের পা আলতোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

১০। পরিষ্কার পানি দিয়ে পা ধুয়ে দিতে হবে।

২। শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভালোমতো পা মুছে দিতে হবে।

১২। পায়ে পর্যাপ্ত লোশন (ময়েশ্চারাইজার) লাগিয়ে দিতে হবে।

১৩। রোগীকে পূর্বের অবস্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে।

১৪। কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো সুশৃংখলভাবে পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

কাজের সতর্কতা:

১। কাজের সময় পিপিই ব্যবহার করতে হবে।

২। রোগীর সহযোগীতে প্রত্যাশা করতে পুরো পদ্ধতিটি বর্ণনা ও শেয়ার নিতে হবে।

৩। সেবাদানকারী যখন রোগীকে সরাতে সাহায্য করবে, তখন নিজের নিরাপদ থাকার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। পায়ে কোনো ইনফেকশন, ক্ষত অথবা ডিসলোকেশন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৫। রোগীকে সাহায্য করার আগে, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত নির্দেশাবলি ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে হবে।

৬।কাজ শুরু করার পূর্বে রোগিকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং করে নিতে হবে।

৭।কাজটি সম্পন্ন করতে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি পায়ের যত্ন নেয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।



চিত্র ৪.৩৬: পা ধুয়ে দেওয়ার পদ্ধতি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। এডিএল কি?

২। মুখ-গহবরের যত্ন নিলে মুখ ও দাঁতের দু'টি সমস্যা উল্লেখ কর।

৩। একটি স্বাস্থ্যকর মুখের জন্য কি কি অভ্যাস থাকা জরুরি?

৪। ডেন্টাল ফ্লসের ব্যবহার কি?

৫। ইনকন্টিনেন্স বলতে কি বোঝায়?

৬। প্রাপ্ত বয়স্কদের ডায়াপারের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

৭। বাচ্চাদের ডায়াপারের প্রকারভেদ তিনটি কি কি?

৮। বয়স্করোগীদের পোশাক পড়ানোর কৌশল লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কেয়ারগিভারের কয়েকটি নিয়মিত কাজ উল্লেখ কর?

২। মুখগহ্বরের যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো কি কি?

৩। রোগীকে ওরাল হাইজিন বজায় রাখতে সহযোগীতা করার সময় কি উপকরন ও সামগ্রীর প্রয়োজন হয়?

৪। রোগীর টয়লেটিং এর জন্য সহযোগীতার প্রয়োজন হয় কেন?

৫। সাহায্যকারী টয়লেটের প্রকারভেদ গুলো কি?

৬। টয়লেট ব্যবহারকে কিভাবে সহজ করা যায়?

৭। একজন ব্যক্তিকে বেডপ্যান ব্যবহার করতে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি সম্পর্কে লিখ।

৮। বাচ্চাদের ডায়াপার পড়ানোর সময় করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

৯। পোশাক পরিধান করিয়ে দিতে করণীয় বিষয়গুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একজন কেয়ারগিভারের জন্য এডিএল-এর ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।

২। কেয়ারগিভারের জন্য এ ডি এল কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

৩। ওরাল হাইজিং সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর?

৪। মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যের দুর্বলতা বোঝার উপায় ও করণীয় কি?

৫। সঠিক পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ ও জিহ্বা পরিষ্কার করার ধাপগুলো ক্রমানুসারে উল্লেখ কর।

৬। রোগীর ওরাল হাইজিন বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় কাজের ধারাগুলো বর্ণনা কর।

৭। টয়লেট বা কমোড ব্যবহার করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

৮। শিশুদের ডায়াপার পড়ানোর সময় অবশ্যই করণীয় ধাপগুলো বর্ণনা কর।

৯। প্রাপ্ত বয়স্কদের ডায়াপার খোলা ও পড়ানোর সতর্কতা বর্ণনা কর।

২০২৩

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।